দাম : সাত টাকা
স্বস্তিকা
৬৪ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ৩০ জানুয়ারি - ২০১২, ১৫ মাঘ - ১৪১৮
প্রজাতন্ত্র দিবস ২০১২
ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারক ভারতীয় সংস্কৃতি

## सुदर्शन भगत

ससद सदस्य (लोक सभा)
लोहरदगा, झारखण्ड

सदस्य :
स्थायी समिति : पेट्रोलियम एव प्राकृतिक गैस
सलाहकार समिति : जनजातिय कार्य एवं पचायती राज मंत्रालय


सत्यमेव जयते

डी–403, एम. एस. फ्लैट्स,
बाबा खडक सिह मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 011–23766461
टेलीफैक्स : 011–23766460
मोबाईल : 9431115340, 9013180273
ई–मेल s.bhagat@sansad.nic.in


## शुभकामना संदेश

दिनॉक:–05,जनवरी,2012

श्रीमान सम्पादक महोदय,

यह जानकर अतिप्रशन्नता हुई कि प्रसिद्ध साप्ताहिक बांग्ला समाचार पत्रिका "स्वास्तिका" इस वर्ष दिनॉक:–30,जनवरी,2012 को गणतन्त्र दिवस विशेषांक प्रकाशित करने जा रही है। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से सभी पाठकों व पत्रिका संचालित करने वाले सभी महानुभावों का बहुत–बहुत धन्यवाद व गणतन्त्र दिवस की शुभकामनाऐं।

बहुत ही हर्ष का विषय है कि वर्ष–1948 से संचालित समाचार पत्रिका "स्वास्तिका" आज पूरे बंगाल प्रांत सहित आसाम व त्रिपुरा जैसे प्रदेशों में सभी शहरों ही नहीं अपितु इन प्रांतों के गांव–गांव तक पंहुचने में कामयाब हुई है। अपनी विश्वसनीयता व प्रमाणिकता के आधार पर न केवल इस प्रसिद्ध बांग्ला पत्रिका "स्वास्तिका" ने अपने पाठकों की संख्या में वृद्धि की है, अपितु जनता को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर निरन्तर जागरुक करने का सराहनीय कार्य भी किया है।

इस अंक में आपके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को चयनित किया यह भी सराहनीय कार्य है। अतः आपकी प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका "स्वास्तिका" के माध्यम से एक बार पुनः सभी देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपकी यह पत्रिका भविष्य में भी इसी प्रकार देश को जागरुक व प्रशासन को सर्तक करती रहेगी।

धन्यवाद सहित।

आपका,

(सुदर्शन भगत)

सम्पादक महोदय,
"स्वास्तिका"
27/1–बी,बिधान सरानी,कोलकता–700006.

# সূচিপত্র


**সম্পাদকীয়** ❑ ৭

**রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলা চলছে** ❑ ৮

**'পরিবর্তন' কি কেবলই রঙে— লাল থেকে সবুজে?** ❑ ৯

**দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা** ❑ দেবীপ্রসাদ রায় ❑ ১১

**ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারক ভারতীয় সংস্কৃতি** ❑ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী ❑ ১৬

**প্রজাতন্ত্র দিবস ২০১২ : চাই ব্যবস্থা পরিবর্তন** ❑ রবিরঞ্জন সেন ❑ ১৯

**জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্দীপিত হওয়ার সময় এসেছে** ❑ কাঞ্চন গুপ্ত ❑ ২৩

**ভারতের স্বদেশী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োজন** ❑ সুধীন্দ্র কুলকার্ণী ❑ ২৭

**জাতীয় জীবন-মরণ সমস্যায় আজও অপরিহার্য যুগাচার্য**
**স্বামী প্রণবানন্দের পথনির্দেশ** ❑ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ ❑ ৩১

**উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা : মায়াবতীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাচ্ছে সব দলই** ❑ ৩৪


**প্রচ্ছদ নিবন্ধ**

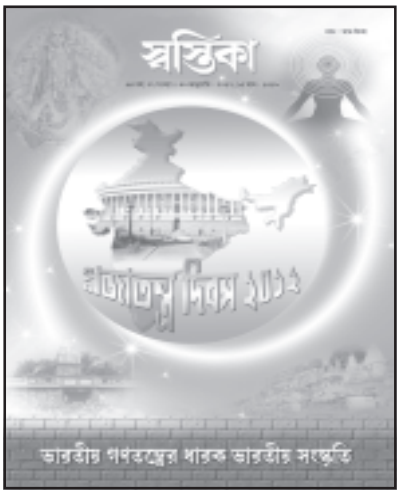


**ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারক ভারতীয় সংস্কৃতি — ১৬-২৩**


**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

৬৪ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ১৫ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৩০ জানুয়ারি - ২০১২

**দাম : ৭ টাকা**

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

**Postal Registration No.**-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

# সম্পাদকীয়

## সাধারণতন্ত্র দিবসের আহ্বান

*আবার ২৬ জানুয়ারি। আরও একটি সাধারণতন্ত্র দিবস। কুচকাওয়াজ, নানা রকমারি প্রদর্শন। এই সবকিছুই ধারাবাহিক প্রথামাফিক চলিতে থাকিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে দেশ ও জাতি (Nation) রাষ্ট্রজীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে কতটা প্রগতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশবাসী বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাভিমান, স্বদেশী ও সম্পদে কতটা বলীয়ান হইয়াছে। জীবনযাপনের প্রাথমিক আবশ্যকতা— অন্ন-বস্ত্র- বাসস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-স্বাবলম্বনে দেশবাসী কতটা পারঙ্গম বা অগ্রগতি অর্জন করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত অঞ্চল কতটা সুরক্ষিত— ইহাও পুনর্বিবেচনার পর্যালোচনার পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন। তাহা না হইলে সর্বসাধারণের 'তন্ত্র' বা ব্যবস্থা দেশে কতটা সফল তাহা অবগত হওয়া যায় না।*

*জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি সত্ত্বেও দেশে সাফল্য ও ব্যর্থতা পাল্লা দিয়া চলিতেছে। স্বাধীনতা (১৯৪৭) লাভের পর ভারতবর্ষ দুইবার 'দেশের মাটি' হারাইয়াছে। কয়েকবার যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছে। আবার জয়লাভ সত্ত্বেও নীতি-নির্ধারকদের কারণে হৃত-জমি পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ।*

*জেহাদি ও মাওবাদী 'লাল-সন্ত্রাস' ক্রমাগত দেশের বিশাল এলাকায় প্রভাব বিস্তার করিয়া নিরাপত্তারক্ষী ও দেশের নিরপরাধ নাগরিকদের প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে। ইহা যে অতীব দুশ্চিন্তার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।*

*স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার দীর্ঘকাল বাদেও বিপুলসংখ্যক ভারতবাসীর মাথার উপর ছাদ, দুইবেলা উদরপূর্তির সংস্থান নাই। নাই সুলভ চিকিৎসাব্যবস্থা বা শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ। সর্বশিক্ষা অভিযান-এর সাফল্য-ব্যর্থতা, চিকিৎসার অভাবে বা প্রভাবে জীবনান্ত যেন ললাটলিখন।*

*এতদ্‌সত্ত্বেও দেশ আগাইয়া চলিতেছে। মার্কিনী দাদাগিরিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া পারমাণবিক পরীক্ষা, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাষ্ট্রজীবনকে সচল রাখা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তথাপি দুর্নীতি লইয়া দেশে প্রবল জনজাগৃতি আশার আলো জ্বালাইয়া চলিতেছে। জেহাদি ও মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে অনেকাংশে অগ্রগতি হইলেও রাজনৈতিক কারণে নানা প্রতিকূলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। আবারও একবার সাধারণতন্ত্র দিবসে গণতন্ত্রের পীঠস্থান ভারতীয় সংসদভবন আক্রমণকারীকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে সযত্নে রক্ষা করার দায় কাহার, তাহা দেশের আম-জনতার জানিতে চাওয়া কোনওরূপ অনধিকার নহে। মুম্বাই আক্রমণকারীকেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অদ্যাবধি প্রদান করার অপারগতা দেশকে রাজনীতির কোন্ কূটকচালির অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে তাহাও জিজ্ঞাস্য।*

*দেশের সর্বসাধারণ নাগরিককে দেশ ও রাষ্ট্রের উত্থানে আগাইয়া আসিতে হইবে। বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার শপথ লইবার দিন এই সাধারণতন্ত্র দিবস। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে দেশকে সর্বতো স্বাধীন করিবার শপথ গৃহীত হইয়াছিল। সেইদিনটি আপামর ভারতবাসীকে পুনঃস্মরণ করিতে হইবে।*

## জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

***এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে : 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ'—বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানিবে? জ্ঞাতাকে কখনও জানিতে পারা যায় না, কারণ যদি তাঁহাকে জানা যাইত, তাহা হইলে তিনি আর জ্ঞাতা থাকিতেন না। দর্পণে যদি তোমার চক্ষুর প্রতিবিম্ব দেখ, উহাকে তুমি কখনও চক্ষু বলিতে পার না; উহা অন্য কিছু, উহা প্রতিবিম্বমাত্র। এখন কথা এই, যদি এই আত্মা— এই অনন্ত সর্বব্যাপী পুরুষ সাক্ষিমাত্র হইলেন, তাহা হইলে আর কি হইল? ইহা তো আমাদের মতো চলিতে ফিরিতে, জীবনধারণ করিতে এবং জগৎকে সম্ভোগ করিতে পারে না; সাক্ষিস্বরূপ যে কিরূপে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, লোকে সে-কথা বুঝিতে পারে না। 'ওহে হিন্দুগণ, তোমরা সব সাক্ষিস্বরূপ—এই মতবাদের দ্বারাই তোমরা নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ'—এই কথাই লোকে বলিয়া থাকে। তাহাদের কথার উত্তর এই—যিনি সাক্ষিস্বরূপ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। কোনও স্থানে যদি একটা কুস্তি হয়, তাহা হইলে ওই কুস্তির আনন্দভোগ—বেশী করে কাহারা?—যাহারা কুস্তি করিতেছে তাহারা, না দর্শকেরা? এই জীবনে যতই তুমি কোন বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ হইতে পারিবে, ততই তুমি অধিক আনন্দ ভোগ করিবে। ইহাই প্রকৃত আনন্দ; আর এই কারণে তখনই তোমার অনন্ত আনন্দ সম্ভব, যখন তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ হও। তখনই তুমি মুক্তপুরুষপদবাচ্য। যে সাক্ষিস্বরূপ, সে-ই শুধু স্বর্গে যাইবার বাসনা না রাখিয়া, নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান হইয়া নিষ্কামভাবে কাজ করিতে পারে। যে সাক্ষিস্বরূপ, সে-ই আনন্দ ভোগ করিতে পারে, অন্য কেহ নহে।***

***—স্বামী বিবেকানন্দ।***

# রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলা চলছে

**নিশাকর সোম**

রাজ্যে এখন শাসক জোটের মধ্যে মাৎস্যন্যায় চলছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধী মন্ত্রীদের ডানা ছাঁটা হচ্ছে। আপাতত কংগ্রেসের মন্ত্রী মনোজ চক্রবর্তীর উপর ধাক্কা পড়েছে। এর পরের ধাক্কা আসবে কৃষিমন্ত্রী রবীন ভট্টাচার্য, নুরে আলম চৌধুরীদের উপর। বিদ্রোহী মন্ত্রী মনোজ চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীর নির্দেশ মতো মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করছেন। মনোজবাবুর প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে— তা জোট রাজনীতিতে বিরল। অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে কারুর প্রতি বিরূপভাব সৃষ্টি হলেই তিনি তাঁকে 'শেষ' করে দিতে ইতস্তত করেন না। স্মরণ করা যায় এমনকী অজিত পাঁজাকেও তিনি হেনস্থা করেছিলেন। তখন অজিত পাঁজা বলেছিলেন— 'মমতাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো দরকার।' এখন বোধহয় তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত পাঁজার পুত্রবধূ ডাঃ শশী পাঁজাকে মন্ত্রী করার কথা ঘোষণা করছেন! সংবাদে 'সম্ভাব্য মন্ত্রী' নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হতে পারে। কিন্তু কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখে 'সম্ভাব্য মন্ত্রী'র নামের ঘোষণা অভূতপূর্ব!

মমতার এই এককভাবে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ''আমাদের সুবিধা হচ্ছে— মন্ত্রিসভার নেতা ও দলীয় নেতা এক হওয়াতে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।'' বিদ্রোহী মন্ত্রী মনোজ চক্রবর্তী ঠিক এই প্রসঙ্গেই বলেছেন— 'স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় সরকার চলছে।' মনোজবাবু কিছু রাখঢাক না করেই কংগ্রেসি মন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সমালোচনা করে বলেছেন, 'মানসবাবু দ্বিচারিতা করছেন। তিনি আমাকে একরকম বলেন আর মমতার ঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন!'

কংগ্রেস হাইকম্যান্ড এ ব্যাপারে মনোজবাবুকে তাঁর অনুরোধ মতো তাঁকে পদত্যাগের অনুমতি দিয়েছে। রাজ্য কংগ্রেসের জনৈক জেলা সভাপতি বলেছেন— ''যদি কংগ্রেসের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় তবে মমতা এনডিএ-এর দিকে পা বাড়াবে।'' এ দিকে তৃণমূলের কোনও কোনও নেতা বলছেন— ''মমতা সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোট গঠন করে কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করতে এগোচ্ছেন!''

'প্রমোটেড মন্ত্রী' সুব্রত মুখার্জির বক্তব্য ''মমতার দয়াতে কংগ্রেসিরা মন্ত্রী হতে পেরেছে।' নতুন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মনোজ চক্রবর্তীকে অশিক্ষিত বলেছেন। মনোজবাবুর ব্যাপারে পার্থ চ্যাটার্জির বক্তব্য ''পাগলের প্রলাপ— মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে গিয়ে যা বলার বলুক।''

বারুইপুরের একটি অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''৩৪ বছর ধরে সিপিএম তাঁদের মনোনীতদের কলেজে কলেজে টিচার-ইন-চার্জ করে কলেজের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হস্তগত করেছে।'' এখন এইসব কলেজে সিপিএম-মনোনীত কমিটি ভেঙে দিতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো পলিটেকনিক কলেজের শিলান্যাসে মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-এর অনুপস্থিতি। রবিরঞ্জনবাবুর কি বিদায় আসন্ন? ইতিমধ্যে শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালকে সরে যেতে হয়েছে মমতা-বৃত্ত থেকে। বিভিন্ন ভাবে যা জানা যাচ্ছে তা হলো— সুনন্দবাবু এবং রবিরঞ্জনবাবু শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করাতেই মমতা ক্ষুব্ধ। কারণ মমতার অভিমত হলো তিনিই নীতি ঠিক করবেন। সেটাই শেষ কথা। অন্যদের নীতিগত কথা বলার দরকার নেই। কেবলমাত্র কাজটি সম্পাদন করাই দায়িত্ব। তৃণমূল নেতারা বলে থাকেন এক নেতাই ভালো। একসময়ে কংগ্রেস স্লোগান দিয়েছিল— 'একনেতা-একদল-একদেশ।' ইন্দিরা গান্ধীর স্তুতি করতে বলা হয়েছিল 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা' এই জন্যই তাঁকে বাঁচাতে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। ইন্দিরা-বিরোধী কংগ্রেস নেতাদেরও বিরোধী নেতাদের সঙ্গে কারাগারে স্থান হয়েছিল। একথা ভুলে গেলে চলবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ফসলের দাম না পেয়ে কোনও চাষি আত্মঘাতী হননি।' তিনি রেকর্ড খুঁজে দেখানোর কথা বলেছেন যে বামফ্রন্টের আমলে শত শত মানুষ আত্মহত্যা করেছিলেন। ঠিক কথা, বামফ্রন্টের এই কলঙ্কজনক ভূমিকার জন্যই তো মানুষ তাদের শাসনব্যবস্থা থেকে অপসারণ করেছেন। বানতলায় নারী নিগ্রহের ঘটনায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন ''এরকম ঘটনা তো ঘটেই থাকে।'' একই কণ্ঠস্বর দেখা যাচ্ছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠেও।

পঞ্চায়েত নির্বাচন এগিয়ে আনার আভাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধীদের বক্তব্য ''যতদিন দেরি হবে ততই তাঁর জনপ্রিয়তা টান ধরবে। আর বিরোধীদের (কংগ্রেস সমেত) পঞ্চায়েত দখল করার সুবিধা হবে।'' মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— শিশুমৃত্যু স্বাভাবিক। এতো বুদ্ধ-সূর্যর অতীতের বক্তব্যের প্রতিফলিত উক্তি! হায় পশ্চিমবঙ্গ— তোমার ভাগ্য নিয়ে এক জুয়া খেলা চলছে।

# ‘পরিবর্তন’ কি কেবলই রঙে— লাল থেকে সবুজে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতার সংবাদমাধ্যমের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। গত ১৯ জানুয়ারি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল দলের পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনে দলের নেত্রী বলেছেন, ‘‘বাংলার সব খবরের কাগজ এবং টিভি চ্যানেল যদি আমার মা মাটি মানুষের সরকারের বিরোধিতা করে তবুও এই সরকার থাকবে।’’ সংবাদমাধ্যমকে নেত্রীর উপদেশ, ‘‘করুন, আরও বেশি করে আমার বিরোধিতা করুন। তবে মিথ্যা কথা লিখলেই এবার থেকে রিজয়েন্ডার দেব। সংবাদমাধ্যমের অশুভ জনবিরোধী সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে।’’ সংবাদমাধ্যমকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘‘মনে নেই? বাম আমলে সাংবাদিকরা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটতেও পারতেন না। সে কথা কী ভুলে গেছেন?’’

মমতা সাংবাদিকদের উপর বেজায় চটেছেন কারণ সংবাদমাধ্যমে কৃষকের আত্মহত্যা, শিশু মৃত্যু, ছাত্র রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে লাগাতার রিপোর্ট লেখা হচ্ছে। যে সব খবর লেখা হচ্ছে তা মমতার মতে শুধু অসত্যই নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যা প্রচার। রাজ্যে ২৪-২৫ জন কৃষক ঋণের ফাঁদে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। মমতা বলেছেন, ‘‘আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি একটাও কৃষক আত্মহত্যা করেনি’’। তবে কী এতজন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা সাংবাদিকরা বানিয়ে লিখেছেন? ২৪ জন কৃষকের আত্মহত্যার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, ডাক্তারবাবুদের সই করা ডেথ সার্টিফিকেট, মৃতদের পরিবারের হাহাকারের ছবি ইত্যাদি সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখেছি।

সবচেয়ে বিপদ হয়েছে সম্প্রতি মালদায় সরকারি হাসপাতালে ধারাবাহিক শিশু মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে। মমতা বলেছেন, হাসপাতালের গাফিলতিতে একটাও শিশু মারা যায়নি। মরা বাচ্চা নিয়েই হাসপাতালে এসেছিল বাবা-মা। মৃত শিশুদের সবার ওজন ছিল ৫০০-৭০০ গ্রাম। এই সব অপুষ্ট ওজনের বাচ্চারা বাঁচে না। দিদি বলেছেন, ‘‘জন্মের সময় বাচ্চার ওজন ১৫০০ গ্রাম হওয়া উচিত’’। ব্যস, সংবাদমাধ্যমে অমনি শোরগোল শুরু হয়ে গেল। শিশু চিকিৎসকরা আমতা আমতা করে বললেন পশ্চিমবঙ্গে নবজাতকদের গড় ওজন থাকে ৩ কিলোগ্রাম। সাধারণভাবে সাড়ে তিন কিলোগ্রাম। তবে দিদি যখন বলছেন ১৫০০ গ্রাম তখন রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর নবজাতকদের ওজন নিশ্চয়ই কমেছে! মেদহীন স্লিম বাচ্চারাই জন্মাচ্ছে। হতেই পারে। দিদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কলকাতাকে তিনি লন্ডন করে দেবেন। তাই এবার পরিবর্তনের রাজত্বে প্রথম শীতেই কলকাতার আবহাওয়া আর লন্ডনের আবহাওয়া মিলেমিশে কেমন একাকার। কলকাতার মানুষ মুফতে লন্ডনে কাটালেন। তারপরেও সাংবাদিকরা উল্টোপাল্টা মিথ্যে কথা লিখে বাজার গরম করতে চাইলে দিদির রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এইতো গত সপ্তাহে

**গূঢ়পুরুষের**

**কলম**

একটা বাণিজ্যিক বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে দিদি জানতে পারেন ছবিটির শ্যুটিং জুরিখ এবং প্যারিসে হয়েছে। ফলে প্রযোজককে কয়েক কোটি টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। দিদি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের স্বার্থে তিনি এখানেই সুইৎজারল্যান্ড এবং প্যারিসের থেকেও ভাল শ্যুটিং লোকেশন বানিয়ে দেবেন। দিদি যখন বলেছেন তখন আর প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্ন করলেই সরকারি খরচে ঠোঁটে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দেওয়া হবে। পরিবর্তনের বাজারে ঠোঁট কাটা সাংবাদিকদের এটাই উপযুক্ত শাস্তি।

ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের লাগাতার অপপ্রচার চলছে। দিদি বলেছেন, রাজ্যে ১৬০০ সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ আছে। তার মধ্যে মাত্র ৮-১০টা কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়ে সামান্য ঝামেলা হয়েছে। সেটাই ‘ব্রেকিং নিউজ’। তিলকে তাল করার চেষ্টা। যে সব কলেজে ঝামেলা হয়েছে সেখানের অধ্যক্ষরা সিপিএমের দলদাস। তারা পার্টির স্বার্থে কাজ করে। কলেজের অধ্যক্ষরা যদি পদের সুযোগ নিয়ে পার্টিবাজি করে তবে ছাত্রদের চড় থাপ্পড় তো খেতেই হবে! দলদাস অধ্যক্ষদের উচিত স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে চলে যাওয়া। যোগ্যতায় নয়, পার্টি এইসব অধ্যক্ষদের চেয়ারে বসিয়ে ছিল। পার্টিকে বাংলার মানুষ তাড়িয়েছে। এবার দলদাসদের গলাধাক্কা দেওয়া হবে।

সমস্যা হয়েছে সাংবাদিকদের নিয়ে। কিছুতেই এদের শায়েস্তা করা যাচ্ছে না। বাম সরকারের ৩৫ বছরের রাজত্বে নানা নির্যাতন করেও পার্টির স্তাবকতা করতে সাংবাদিকদের বাধ্য করা যায়নি। মমতা তখন সাংবাদিকদের লড়াইকে কুর্নিশ করেছিলেন। বলেছিলেন, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ভেঙে দেওয়া প্রেস কর্নার পুরানো স্থানেই গড়ে দেবেন। দেননি। বদলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের গড়া প্রেস কর্নারকে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছেন। বিদায়বেলায় বাম সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিকদের মাসে মাসে সামান্য আর্থিক সাহায্য করা হবে। বাম সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। পালা বদলের পর দিদি রাইটার্সে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর ঘোষণা করেছিলেন যে বাম সরকার দুঃস্থ প্রবীণ সাংবাদিকদের ধাপ্পা দিয়েছিল। তাঁর সরকার প্রতারণা করবে না। প্রবীণ সাংবাদিকরা কেউই সরকারি বেসরকারি কোনও সংস্থা থেকেই পেনশন বা আর্থিক সাহায্য পান না। দিদি বলেছিলেন, তাঁর সরকার বৃদ্ধ, অশক্ত, দরিদ্র সাংবাদিকদের পেনশন দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতির ৮ মাস পরে বোঝা গেছে ধাপ্পার রাজনীতিতে বাম দাদাদের সঙ্গে ঘাস ফুলের দিদিদের বিশেষ পার্থক্য নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা সোজাসুজি বলে দেওয়া দরকার। সাংবাদিকরা প্রাক্তনই হন অথবা কর্মরত কেউই সরকারি দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশা করেন না। অর্থ উপার্জনের জন্য সাংবাদিকতার পেশায় তাঁরা আসেননি। হয়তো দু’ চারজন করিৎকর্মা স্তাবক সাংবাদিক এর ব্যতিক্রম হতে পারেন। তবে জোর দিয়ে বলতে পারি সারা দেশের ৯৫ শতাংশ সাংবাদিক স্বেচ্ছায় মানুষের স্বার্থরক্ষায় এই পেশায় যোগ দিয়েছেন। মানুষের স্বার্থেই সাংবাদিকরা খবর লেখেন। কৃষকের আত্মহত্যার কথা লেখার সময় সাংবাদিকরা মনে রাখেন না যে এতে কোনও দলের বড় বড় দাদা দিদিদের সমস্যা হবে। শিশু মৃত্যুর ঘটনা লেখার সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কতটা অসুবিধা হবে। অথবা মৃত বাচ্চাদের ওজন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার কথা মাথায় রাখেন না। আর রাখেন না বলেই রাইটার্সের গদিতে যখন যাঁরা বসেন তাঁরাই সাংবাদিকদের ‘গণশত্রু’ মনে করেন। জ্যোতিবাবু বুদ্ধবাবুরা মনে করতেন। এখন দিদি এবং দিদির অনুগত ভাইয়েরা মনে করেন। পরিবর্তন যেটা হয়েছে তা কি তবে শুধুই রং বদল? ছিল লাল, হলো সবুজ?

# নেতাজীর সশস্ত্র সংগ্রামই ইংরেজদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল : সুরেশ সোনী

**বাসুদেব পাল।।** ''দেশ বর্তমানে এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে চলছে। 'আলো ও 'অন্ধকার' এবং 'অন্ধকার ও আলো'র মধ্যে এক সময় থাকে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের হিন্দু জীবনদর্শন বিবিধ সঙ্কটগ্রস্ত পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারে। তবে সেজন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, অনুশাসনবদ্ধ, চরিত্রবান ও সংগঠিত সমাজশক্তির প্রয়োজন। এর কোনও শর্টকাট নেই। পরমবৈভব সম্পন্ন রাষ্ট্রনির্মাণের জন্য যতটা মূল্য প্রয়োজন ততটাই দিতে হবে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারও একথা বলে গেছেন। সেজন্য স্বয়ংসেবকদের স্বয়ংপ্রেরিত হয়েই কাজ করে যেতে হবে। শহরে তিন শতাংশ এবং গ্রামে এক শতাংশ স্বয়ংসেবক— এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।'' গত ২৩ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রকানন পার্কে কলকাতা মহানগরের সহস্রাধিক স্বয়ংসেবকের পূর্ণ গণবেশে এক সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক) সুরেশ সোনী। বস্তুতপক্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১১৬তম জন্মদিন উপলক্ষেই কলকাতা মহানগরের স্বয়ংসেবকদের একত্রীকরণের আয়োজন হয়েছিল।

রবীন্দ্রকানন পার্কে প্রবেশ করেই সুরেশজী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস এবং কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁরাও নেতাজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদিন উপস্থাপিত স্বয়ংসেবকরা সমবেত ভাবে দণ্ড, যোগব্যায়াম, যোগাসন প্রদর্শন করে দেখান। তাঁর ভাষণের শুরুতেই সুরেশজী বলেন, ইংরেজরা ১৯৪৭ সালের ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল নেতাজীর সশস্ত্র সংগ্রামের কারণেই। যদি একথা তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলনেতা চার্চিলকে এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন। এমনকী পরে ভারত সফরে এসে কলকাতায় রাজভবনে রাজ্যপালকেও স্বয়ং অ্যাটলি একই কথা বলেছিলেন। ইংরেজরা তাদের ভারতীয় সৈন্যদের আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। ইতিহাসে যাই লেখা থাকুক নেতাজীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। তিনি বহির্ভারতে ভারতীয়দের দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত করেছিলেন। এদিন মঞ্চে উপবিষ্ট সকলের পরিচয় করিয়ে দেন কলকাতা মহানগর সম্ভাগ কার্যবাহ জয়ন্ত পাল এবং শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমভাগ কার্যবাহ ব্রহ্মানন্দ বঙ্গ।

*স্বয়ংসেবক সমাবেশে সুরেশ সোনী (বাঁ দিক থেকে তৃতীয়)। ছবিতে বাম দিক থেকে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বিশ্বাস ও ডানদিকে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।*

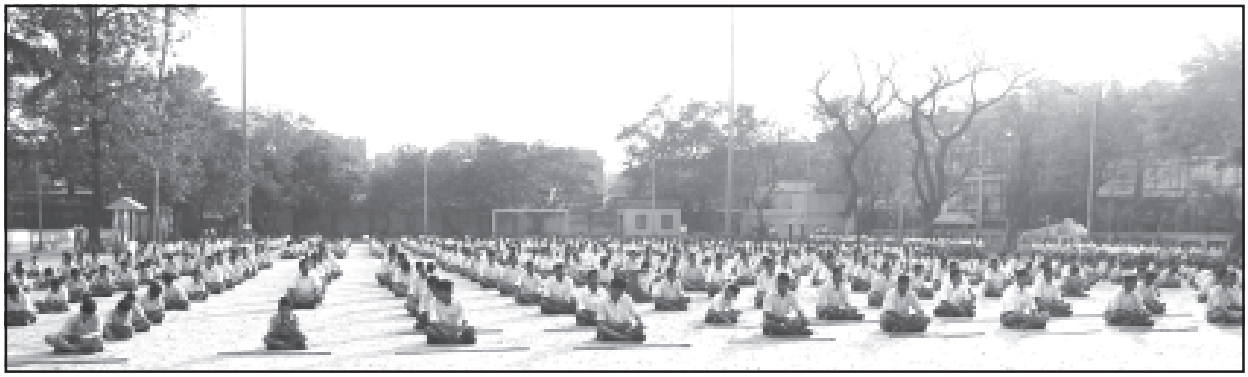

*কলকাতার রবীন্দ্রকানন পার্কে স্বয়ংসেবক সমাবেশ।*

# দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

**দেবীপ্রসাদ রায়**

সংবাদপত্রে প্রকাশিত দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তনে মমতার উদ্যোগ বিশেষভাবে স্বাগত জানানোর যোগ্য। রাজনীতি আজ দলবাজির নির্লজ্জ প্রয়াসে কলঙ্কিত। গণতন্ত্রকে ধূলায় লুণ্ঠিত হতে হয়েছে জীবনচর্যার প্রায় সর্বদিকেই। সাধারণ প্রশাসন পঙ্গু হয়ে গেছে দলবাজির জন্য। দলবাজির তাণ্ডবে অসহায় হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ। গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক সাধারণত রক্ষিত হোত তা দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে সমূলে বিনষ্ট হয়েছে, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের বাতাবরণে তা কলুষিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। গত ৩৪ বছর ধরে সৃষ্ট ও পুষ্ট দমবন্ধকারী এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায় গ্রামীণ মানুষ। অথচ কীভাবে তা প্রকাশ করবে সেটা জানে না তারা। এই মুক্তির ইচ্ছা সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আভাসিত হয়েছে এবং তা বিস্তৃত হয়েছে গ্রাম থেকে শহরেও। ঠিক এরই জন্য ২০০৭ সালের ১৪ নভেম্বর যে মহামিছিল হয়েছিল দলমত নির্বিশেষে মানুষের যোগদানে, মানবতার অবমাননার বিরুদ্ধে তার ইতিবাচক দিকটি আর অবরুদ্ধ থাকছে না। দলবাজি কলঙ্কিত রাজনীতির— অবসান ঘটানোর যে সুযোগ এসেছে তাকে মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে বা ফিরে পাওয়ার স্বার্থেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সামাজিক আন্দোলনই প্রয়োজন কিন্তু তার সূচনায় যদি রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকে তাহলে তা বিশেষভাবে কাম্য এবং এই পরিস্থিতিতে আশাতীত পাওয়া। মমতার উদ্যোগ সেদিক থেকে একান্তভাবে সমর্থনযোগ্য।

ভারতীয় চিন্তাবিদ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম এন রায়)-ই প্রথম রাজনৈতিক দলবাজির প্রকোপ এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাই ভারতে তাঁর নিজের তৈরি করা দল Radical Democratic Party- কে ১৯৪৮ সালে কলকাতা সম্মেলনে ভেঙে দেন ও তাঁর চিন্তাপ্রসূত নবমানবতাবাদ (New Humanism) নির্ভর সমাজ গঠনে এক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এরই প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৪৫ সালে 'স্বাধীন ভারতের খসড়া সংবিধান' তিনি রচনা

*এম এন রায়*

করেছিলেন। এতে ছিল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত 'পিপলস কমিটি' সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ গ্রামস্তরে-এর সদস্য দ্বারা নির্বাচিত জেলা কমিটি যারা আবার রাজ্যকমিটি তৈরির জন্য 'ইলেকটোরাল কলেজ' তৈরি করবে এবং সবশেষে রাজ্যকমিটির দ্বারা নির্বাচিত হবে কেন্দ্রীয় কমিটি। পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসন তৈরির প্রকল্প ছিল। গান্ধীজীও বিকেন্দ্রিত প্রশাসনভিত্তিক 'গ্রাম স্বরাজ' এর ধারণা দিয়েছিলেন। দলমুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি কংগ্রেস দলকেই ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন যা বাস্তবায়িত হতে পারেননি ক্ষমতা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব কংগ্রেস নেতাদের জন্য। এবং দলীয় রাজনীতি-ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কুফলগুলিও প্রকটিত হচ্ছিল। স্বাধীন ভারতে এর বিরুদ্ধে 'সর্বাত্মক বিপ্লবের' ডাক দিয়েছিলেন এম এন রায়ের 'পিপলস কমিটি'-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ, কিন্তু তাও গড়ে উঠলো না, দলবাজি দর্শনের রাজনীতি উত্তরোত্তর কার্যত জনবিরোধী হয়ে উঠল। 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মুভমেন্ট'-এর অন্যতম প্রবক্তা নেতা বিচারক ভি এম তারকুণ্ডে ২০০৩ সালে The Radical Humanist পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় 'Partyless Politics and Peoples (Humanist) State : Picture for Public Discussion' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যাতে দলীয় রাজনীতির ফাঁস থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে। কারণ ইতিমধ্যেই পৌরসভা ও গ্রামপঞ্চায়েত স্তরেও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক দলভিত্তিক করা হয়ে গিয়েছিল ক্ষমতা লাভ ও ভোগের জন্য আগ্রহী দলীয় রাজনীতি নির্ভর নেতাদের দ্বারা। অথচ এই দলীয় রাজনীতির জন্যই ভারতীয় জনসাধারণ গোটা ভারত জুড়েই দুর্নীতির কারণে নিষ্পেষিত হচ্ছে, আজ অবস্থা চরমে।

দলহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রী তারকুণ্ডের প্রস্তাবগুলি (তাঁর মতে ব্যাপক আলোচনাযোগ্য) রাখা হলো :

(১) ক্ষমতার রাজনীতির ভিত্তিতে নির্বাচিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি ভেঙে দিতে হবে। রাষ্ট্রের পরিষদীয় কাজকে প্রশাসনিক কাজ থেকে পৃথক করা হবে— এই ভিত্তিতেই সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হবে। সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির কাজ শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এসব আইন কার্যকর করা এবং সরকার চালানোর দায়িত্ব তাদের থাকবে না। এমন আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা লোভে আগ্রহী এমন কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দল কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচনে দাঁড়াতে না পারে।

(২) সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলি ভেঙে দেওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের নির্বাচনের জন্য অ্যাডহক কমিটি তৈরি করবেন (রাজ্যপালরা নির্বাচনের মাধ্যমে আসবেন— এখনকার মতো নিয়োগের মাধ্যমে নয়)। এই অ্যাডহক কমিটিগুলি এমন সব নিয়ম প্রণয়ন করবেন যাতে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল পদে নির্বাচনে সেই সব ব্যক্তিরাই দাঁড়াতে পারেন যাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনা কিছুটা আছে। নির্বাচন অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে হবে।

(৩) যে রীতিতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে কিন্তু কোনও জনপ্রতিনিধি সভা বা পরিষদের কাছে দায়বদ্ধ নয় সে রীতি মানা যাবে না, কেননা সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাষ্ট্রপতির মতো হবেন, তাঁর স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র লোপকারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনা দূর করার জন্য কিছু নিয়মবন্ধন তৈরি করতে হবে :

(ক) রাষ্ট্রপতি যাতে ইচ্ছেমতো তাঁর ক্ষমতা খাটাতে না পারেন তার জন্য দরকার জাগ্রত জনমত যা বেশি কার্যকর হবে। জনগণের তথ্য জানার অধিকার থাকবে। যে কোনও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করতে পারলে বা রোধ করতে পারলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ক্ষমতা যে জনগণের হাতে তা জনগণকে বিশ্বাস করানো যাবে।

(খ) রাজ্যপালদের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে থাকবে যাতে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়, তাঁর ও রাজ্যপালদের মধ্যে বন্টিত থাকে।

(গ) নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গড়বেন যার কাজ হবে প্রশাসনিক কাজে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করা। উপদেষ্টা পর্ষদে পাঁচ থেকে দশজন সদস্য থাকবেন যাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও না কোনও প্রধান দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত। স্বরাষ্ট্র (আইন শৃঙ্খলা), বিদেশ প্রতিরক্ষা, অর্থমন্ত্রক ও ব্যাঙ্কিং, কৃষি, শিল্পোন্নয়ন, জনসংখ্যা, পরিবেশ প্রভৃতির সঙ্গে উপদেষ্টা পর্ষদের সভ্যদের যুক্ত থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যগণ এভাবে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ক্যাবিনেটকে সাহায্য করবেন। কিন্তু তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা উপদেষ্টা পর্ষদের থাকবে না। এটা খুবই দরকার যে একদিকে উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যগণ অপরদিকে রাষ্ট্রপতি ও তাঁর ক্যাবিনেট— এদের নিয়েই অংশগ্রাহী গণতন্ত্র (Participatory Democracy) গঠিত হোক ভারতে। সংঘাত নয়, পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতাই হবে এঁদের মধ্যে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) উপদেষ্টা পর্ষদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রপতি স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, বিদেশ, অর্থ ও ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি দপ্তরের কার্যনির্বাহী প্রধানদের নিযুক্ত করবেন। একেবারে পুরোপুরি প্রশাসনিক দপ্তরের প্রধানদের, এখনকার মতো এই দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগ করা যেতে পারে। বিধানমণ্ডলী এবং উপদেষ্টা পর্ষদের কোনও সদস্যকেই এরকম কোনও দপ্তরের প্রধান করা চলবে না এবং তাঁদের কোনও কার্যনির্বাহী ক্ষমতাও দেওয়া হবে না। এখনকার মন্ত্রিসভার জায়গায় থাকবেন দপ্তরের সেক্রেটারিরা।

(ঙ) রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল এবং উপরে উল্লেখিত জরুরি দপ্তরগুলির প্রধানদের নিয়েই গঠিত হবে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট। এখনকার মতোই সমস্ত জরুরি বিষয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

(চ) লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

(ছ) নির্বাচনের পর আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি এবং তার ক্যাবিনেটের প্রত্যেক সদস্য নির্বাচকমণ্ডলীর আস্থা ভোট নেবেন। যদি রাষ্ট্রপতি বা তাঁর ক্যাবিনেটের কোনও সদস্য নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন তাহলে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে ক্যাবিনেটকে কর্মসূচী (পলিসি) পরিবর্তন করতে বাধ্য করার। এ সত্ত্বেও যদি ক্যাবিনেট নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের সমর্থন না পান তাহলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে এবং সে জায়গায় নতুন নিয়োগ হবে। রাষ্ট্রপতি যদি জনগণের আস্থা ভোট পেতে ব্যর্থ হন তাহলে তাঁর সরকারকে ভেঙে দিয়ে অন্য রাষ্ট্রপতি ও অন্য ক্যাবিনেট নির্বাচিত করতে হবে। অবশ্য যদি ক্যাবিনেটের কোনও ব্যক্তি সদস্য জনগণের অধিকাংশের সমর্থন না পান তাঁর জায়গায় তখন অন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিতে হবে।

(জ) যদি কোনও সময় উপদেষ্টা পর্ষদের অধিকাংশ সদস্য (কোনও একটি সভায় নামমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ চলবে না) সরকারের কোনও একটি কাজ অনুমোদন না করে তাহলে প্রথমে চেষ্টা করতে হবে মতপার্থক্য দূর করার— তাতেও সম্ভব না হলে ওই বিষয়টির উপরই গণভোট নিতে হবে। প্রয়োজন হলে কোন বিষয়ের উপর গণভোট হবে তা স্থির করতে সুপ্রিম কোর্টের সাহায্য নিতে হবে, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টকেও ক্ষমতা দিতে হবে।

(ঝ) রাজ্যপালের উপদেষ্টা পর্ষদ কেন্দ্রের উপদেষ্টা পর্ষদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হতে পারে, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, এই উপদেষ্টা পর্ষদগুলি অংশগ্রাহী গণতন্ত্রের উপায় মাত্র।

(ঞ) উপদেষ্টা পর্ষদের কোনও সদস্যকে কোনও সরকারি পদে নিয়োগ করা চলবে না। যদি কেউ এরকম পদে থাকতে চান তাহলে তাঁকে প্রথমেই উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যপদ ছাড়তে হবে।

**রাজ্য সরকার :**

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আরও বেশি হতে হবে। সাধারণভাবে এই আরও বেশি বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্র থেকে রাজ্যে এবং রাজ্য থেকে গ্রামপঞ্চায়েতে ও পৌরসভাগুলিতে হতে হবে। রাজ্য বিধানসভাগুলির দ্বারা নিযুক্ত উপদেষ্টা পর্ষদগুলি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদের সভ্যদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হবে। 'অংশগ্রাহী গণতন্ত্রে'র সঙ্গে সেটাই হবে সঙ্গতিপূর্ণ।

**গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা :**

(ক) বিভিন্ন রাজ্যে গ্রামপঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির মধ্যে তাদের কাজ ও ক্ষমতার বিরাট পার্থক্য আছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কাজ ও ক্ষমতা তা সংবিধানের একাদশ তফশিলে এবং পৌরসভার কাজ ও ক্ষমতা দ্বাদশ তফশিলে আছে। রাজ্য বিধানসভাগুলি তাদের বিবেচনানুযায়ী এইসব ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভাকে দিতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির ক্ষমতার মধ্যে বিরাট বৈচিত্র্য ও পার্থক্য দেখা যাবে। প্রকৃত লোকতন্ত্রে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির যতটা সম্ভব বেশি ক্ষমতা থাকা উচিত। বিভিন্ন রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির ন্যূনতম ক্ষমতা কী থাকবে তারও একটা ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে সদস্য ব্যক্তিগতভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অন্য কেউ এটা করতে পারবে না। সাধারণভাবে এটা দেখা গেছে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ না থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বা নিজেরা যখন তাঁদের ক্ষমতা ব্যবহার করেন তার ফল বেশ ভালোই

হয়। কৃষি উন্নয়ন, জলবিভাজিকার ব্যবস্থা, অনাবাদী জমির চাষ, বাড়তি বৃক্ষরোপণ, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির মতো কতকগুলি কাজ যতটা সম্ভব গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাথমিক সদস্যরাই করতে পারেন এবং তাঁদের হয়ে অন্য কারও এসব করা উচিত নয়।

(গ) যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতার ব্যবহার ও কাজ পঞ্চায়েতের প্রাথমিক সদস্যরা না করে তাঁদের পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তিরা করে তবে সেই অন্য ব্যক্তিদের প্রাথমিক সদস্যদের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসা উচিত। সেক্ষেত্রে রাজ্যসরকার বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ করতে পারে। প্রাথমিক সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ওই সমস্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনের পর অবশ্যই প্রাথমিক সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। ছোট ছোট পৌরসভাগুলিতেও এই একই নীতি অনুসৃত হবে, এর ফলে রাজ্যের অনেক কাজ রাজ্যের মানুষই করতে পারবেন, তাঁদের হয়ে কাউকে করতে হবে না। অন্য কেউ তাঁদের হয়ে করলে সেই অন্য ব্যক্তিদের প্রাথমিক সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে এবং সেই কারণেই প্রাথমিক সদস্যদের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা থাকবে।

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রতি মাসে জনসভা আহ্বান করবে। এই সভা স্থির করবে পঞ্চায়েতের কোনও কাজ সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে এবং কোনও কাজ সদস্যরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে করবেন। শ্রী তারকুণ্ডে উপস্থাপিত দলহীন রাজনীতির পক্ষে এই প্রস্তাব তর্কাতীত নয়। বিশেষ করে এর বাস্তবায়ন যথেষ্ট জটিলতা আনবে, এই মুহূর্তে পুরোপুরি বোধগম্যও নয় কারণ যেমন দ্বিমাত্রিক জীব কল্পনা কারণে তাদের তৃতীয় মাত্রা ধরা যাক উচ্চতার কোনও ধারণা করা সম্ভব নয়, ত্রিমাত্রিক জীব যেমন আমরা, মানুষরা সাধারণভাবে চতুর্মাত্রিক দেশ— এর ধারণা করে উঠতে পারে না সাধারণভাবে, সেইরকম দলীয় রাজনীতির সর্বাত্মক প্রভাবে অভ্যস্ত জীবনে দলহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা করা মুশকিল। কিন্তু এর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাইলে এই প্রস্তাবকে ফেলে দেওয়াও যেতে পারে না। দুর্নীতিতে হাঁসফাস করছে আমরা লোকপাল বিলের দিকে উৎসুক্য নিয়ে চেয়ে আছি। কেন আন্না হাজারের আন্দোলন আমাদের প্রাণেও সাড়া দেয়— এর প্রতিবিধান আছে তারকুণ্ডের প্রস্তাবেও। সংসদের বাইরে গড়ে ওঠা আইন 'সংসদ'কে অর্থহীন করে তুলবে এ প্রশ্ন উঠছে কংগ্রেস থেকে। কিন্তু দুর্নীতির ব্যাপকতায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হতমান ভারতবাসী চাইছে সংসদে তাদের মনোভাবের প্রতিফলন হোক। জনগণের চাওয়া 'বিল' ও সংসদে শাসকদলের বিল আত্মিকভাবে এক হোক। কিন্তু এই 'এক' না হওয়াটাই দলীয়রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। এবং সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতেই তো সাধারণ মানুষ চাইছে। এই প্রয়াসকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে হলে এর পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার, মমতার পঞ্চায়েত নির্বাচনের দল নির্ভরতা থেকে মুক্তির জন্য প্রস্তাব তাই অত্যন্ত সময়োচিত, সদর্থক এবং এক অর্থে বৈপ্লবিক। এম এন রায়ের পিপলস কমিটির চিন্তা এবং গান্ধীজীর 'গ্রাম স্বরাজ' চিন্তার পুনর্জীবন পাওয়াটা দরকার।

*সূত্র : (১) পুরোগামী, মে ২০০৩,*

***(২) The Radical Humanist, January 2003,***

*(৩) The Radical Humanist, March 2003.*

***[লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক]***

# ভারতীয় গণতন্ত্রের ধারক ভারতীয় সংস্কৃতি

**দেবানন্দ ব্রহ্মচারী**

রাজা দশরথের অনেক বয়স হয়েছে। শরীরও জরাগ্রস্ত। তাই রূপবান, বীর্যবান, অসূয়াশূন্য, বাগ্মী, দেশকালজ্ঞ, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, সর্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে নিজের জীবদ্দশাতেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ, সেনাধ্যক্ষ, পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে রাজসভায় আমন্ত্রণ করলেন। সকলে সমবেত হলে দশরথ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, এই রাজ্যে আমি আমার পূর্বপুরুষদের পন্থা অবলম্বন করে অনিদ্র হয়ে যথাশক্তি প্রজা পালন করেছি, সর্বলোকের হিতসাধনে রত থেকে শ্বেত রাজছত্রের ছায়ায় আমার শরীরকে জীর্ণ করেছি। এখন এই সভাস্থ সকলের অনুমতি নিয়ে পুত্র রামকে প্রজাহিতে নিযুক্ত করে আমার জীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দিতে চাই। আমার পুত্র রাম আমার সমস্ত গুণ নিয়ে জন্মেছে, সে বীর্যে ইন্দ্রের সমান। আমি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি। আমার এই সংকল্প যদি সাধু বিবেচনা করেন তবে আপনারা অনুমতি দিন। যদিও এই প্রস্তাব আমার প্রিয়, তথাপি এর চেয়ে হিতকর অন্য প্রস্তাবও আপনারা চিন্তা করে বলুন। কারণ, পক্ষপাতহীন মধ্যস্থ ব্যক্তিদের বিচারই শ্রেষ্ঠ।

তখন রাজসভায় উপস্থিত সকলে একমত হয়ে দশরথকে বললেন, আপনার অনেক বয়স হয়েছে। আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। দশরথ তাঁদের অভিপ্রায় যেন বুঝতে পারেননি এমন ভাব দেখিয়ে বললেন, আপনারা আমার কথা শোনামাত্র রামকে রাজপদে আসীন দেখতে চাইছেন, তবে আমি কি ধর্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিনি? উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও জনপদবাসীগণ সকলে বললেন, আপনার পুত্রের বহু সদ্‌গুণ, আমরা আপনার পুত্র রামকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে চাই (বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড)।

রামায়ণের এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতের রাজতন্ত্র কখনই একনায়কতন্ত্র ছিল না। সে সময় রাজতন্ত্রের মধ্যেই ছিল গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র। রাজতন্ত্র কখনই হয়ে ওঠেনি একনায়কতন্ত্র। প্রজাদের ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে বসে পরামর্শ করেই নেওয়া হোত কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত। এবং সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোত অবশ্যই জনসাধারণের কল্যাণের জন্য। রাজারা ছিলেন ত্যাগের প্রতীক এবং মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। তাই দেখা গেছে রামচন্দ্র বনবাসে যাবার পূর্বে তাঁর অধিকারে যে সব ধনসম্পদ ছিল সে সবই তিনি প্রজাদের মধ্যে দান করে দিয়ে একরকম নিঃস্ব হয়েই বনবাসের জন্য যাত্রা করেছিলেন। এমন কি সীতা মাও তাঁর সামান্য প্রয়োজনীয় অলংকার রেখে সব অলংকারই দান করে দিয়েছিলেন।

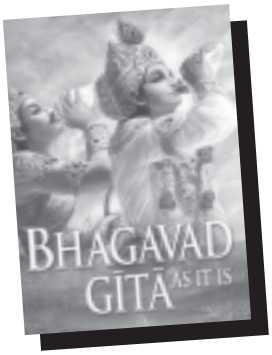


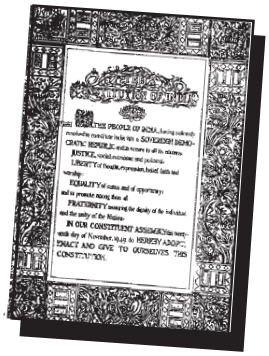

**সংবিধানে বর্ণিত কথাগুলি ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মের গীতা, উপনিষাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বের প্রাচীনতম দেশ, প্রাচীনতম ধর্ম তথা সংস্কৃতির ধারক-বাহক ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির মধ্যে গণতান্ত্রিক- প্রজাতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরাজিত। ভারত তথা বিশ্ববাসী সকলের জন্যই তাঁরা নিত্য প্রার্থনা করেন—**

***সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।***
***সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ***
***দুঃখমাপ্নুয়াৎ।।***

দেশের বর্তমান গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের মতো দেশের মানুষের পয়সায় নিজের আখের গোছানোর ধান্দা তখনকার রাজন্যবর্গের ছিল না। তার ফলে বর্তমান অনেক নেতানেত্রীর মতো তাঁরা কখনই ভ্রষ্টাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না।

আধুনিককালের রাজন্যবর্গের মধ্যে আমরা রাজা হর্ষবর্ধনের কথা পড়েছি। তিনি কুম্ভমেলার পবিত্র লগ্নে প্রজাদের মধ্যে অকাতরে প্রভূত দান করতেন, এমনকী পরিশেষে নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানিও দান করে ফিরতেন। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য বা মহারাষ্ট্রের শিবাজী মহারাজ প্রজাগণের প্রকৃত মঙ্গল, দেশের কল্যাণ ও ত্যাগের আদর্শে রাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শিবাজী যখন রাজা হন তখন তাঁর গুরুদেব রামদাস স্বামী তাঁর গৈরিক উত্তরীয়খানি খুলে দিয়েছিলেন শিবাজীর সাম্রাজ্যের পতাকা করার জন্য। 'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও' (রবীন্দ্রনাথ) গৈরিক পতাকা ত্যাগের প্রতীক— রামদাস তাঁর শিষ্য শিবাজীকে ত্যাগের আদর্শে রাজ্য শাসন করতে বলেছিলেন। শিবাজী মহারাজ দেশের সার্বভৌম রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষভাবে রাজ্য শাসন এবং সকল মানুষের প্রতি সমান মর্যাদা দান করেছিলেন।

১৯৫০ খৃস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতের প্রথম সংবিধান যা

১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় সেটি কার্যকর হয়। ওই দিন থেকে ভারত একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দিনটি তাই ভারতের 'সাধারণতন্ত্র দিবস' হিসাবে চিহ্নিত। পরে ১৯৭৬ খৃস্টাব্দে ৪২তম সংশোধনে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটি যুক্ত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় কি বলা হয়েছে? সেখানে বলা হয়েছে--- 'নারীপুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার ভোগ করবে'। কিন্তু আজ বহুলাংশেই দেখা যাচ্ছে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

সংবিধানে বর্ণিত কথাগুলি ভারতের সনাতন হিন্দুধর্মের গীতা, উপনিষাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বের প্রাচীনতম দেশ, প্রাচীনতম ধর্ম তথা সংস্কৃতির ধারক-বাহক ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির মধ্যে গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরাজিত। ভারত তথা বিশ্ববাসী সকলের জন্যই তাঁরা নিত্য প্রার্থনা করেন—

*সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।*
*সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।।*

অর্থাৎ সকলে সুখী হোক, সকলে রোগমুক্ত হোক, সকলে শুভ দর্শন করুক, কারুর যেন কখনও দুঃখ না হয়। এই উদার চিন্তাভাবনা থেকে মহত্তর লোক কল্যাণের ভাবনা আর কি হতে পারে! শাস্ত্রের এই বাণীগুলি যদি রাজনৈতিক নেতৃবর্গ থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নিজের জীবনে রূপায়িত করতে পারতেন— তাহলে প্রজাতন্ত্রের অবক্ষয়সূচক ওপর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত এমন নৈতিক অবনতির নগ্নচিত্র আমাদের কাছে ফুটে উঠতো না।

গণতন্ত্র সকলের মতামতের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বলে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলে। প্রজাতন্ত্র সকল মানুষের সমান অধিকারের, সমান কল্যাণের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি আজ আমাদের অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে। এমত অবস্থায় মনে হয়, ঋগ্বেদের সেই বিখ্যাত বাণীটি একবার স্মরণ করা উচিত, যেটি প্রজাতন্ত্রের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য—

*সং গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।*
*দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানাঃ উপাসতে।।*
*(ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২-৪)*

অর্থাৎ তোমরা সকলে আন্তরিকভাবে এক হয়ে চল, দেশ সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে এক রকম কল্যাণপ্রদ বাক্য প্রয়োগ কর, পরস্পরের মনকে সমানভাবে জানার চেষ্টা কর। দেবতারা যেমন একসঙ্গে মিলিত হয়ে কল্যাণের জন্য যজ্ঞের আহুতি থেকে হবির্ভাগ (ঘৃতের অংশ) গ্রহণ করেন, তেমনি তোমরাও (হে মানবগণ!) সেরূপ মিলিত হয়ে সকলে সমানভাবে খাদ্য-শস্যাদি থেকে ধনসম্পত্তি পর্যন্ত সবকিছু গ্রহণ কর (কেউ যেন বঞ্চিত না হয়)।

ভারতবর্ষের বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকেই প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার উপদেশ দেখতে পাওয়া যায়। তাই ভারতে বরাবর রাজতন্ত্র থাকলেও রাজারা শাস্ত্রানুসারে জীবনযাপন করতেন ও ব্যাসদেব, বশিষ্ঠাদি ঋষিদের পরামর্শে রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকতেন।

সেজন্য আনুষ্ঠানিকভাবে, প্রজাতন্ত্র না থাকলেও রাজন্যবর্গ ও প্রজাবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ছিল গণতন্ত্র তথা প্রজাতন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা।

★

# প্রজাতন্ত্র দিবস ২০১২
# চাই ব্যবস্থা পরিবর্তন

রবি রঞ্জন সেন

জন-সুনামী : দুর্নীতির প্রতিবাদে আন্না হাজারের সমর্থনে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

ভারতের প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস লেখার সময় সন ২০১১ দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের মানুষের গর্জে ওঠার বছর বলে পরিগণিত হবে। গত এক বছরের ঘটনা পৃথিবীর মানুষের সামনে যেন এক নতুন ভারতবর্ষকে তুলে ধরেছে। বিভিন্ন জনমাধ্যম এবং বিশ্লেষকবর্গ এই দেশের মানুষকে, যাঁদেরকে তারা দুর্নীতির প্রতি সহনশীল ও দেশের নেতাদের কুকর্মের বিষয়ে নির্লিপ্ত বলে মনে করত, তাঁদের যেন নতুন চোখে দেখতে বাধ্য হয়েছে। যে দেশের মানুষকে মনে করা হয়েছিল যে সংকীর্ণ জাত-পাত, ভাষা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে হয়তো বা রাস্তায় নামলেও নামতে পারে, কিন্তু সুশাসনের অধিকারকে কেন্দ্র করে কখনই রাস্তায় নামবে না, সেই দেশের মানুষ হঠাৎ বিরোধী আন্দোলনকে সুনামিতে বদলে দিতে পারে এমনটা কেউ কোনওদিন ভাবতেও পারেনি!

যাঁরা এতদিন বলতেন ভারতবর্ষের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দুর্নীতি এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে এর থেকে মুক্তি অসম্ভব এবং মানুষ এটিকে জীবনের অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছে; আন্না হাজারে, বাবা রামদেব এবং ইউথ এগেইনস্ট করাপশন দ্বারা পরিচালিত গত এক বছরের আন্দোলন তাদের গালে থাপ্পড়ের মতো এসে পড়েছে। আর যাঁরা বলতেন যে ভারতের যুব-সমাজ নির্লিপ্ত, তারা শুধু নিজেদের 'কেরিয়ার' আর বাজারে সাম্প্রতিকতম মোবাইল ফোন ছাড়া কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাঁরাও নিজেদের মতামত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ এই সমস্ত আন্দোলনের ডাকে সারা ভারতবর্ষে যে ব্যাপক জনজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা দেখিয়ে দিয়েছে যে নাগরিক হিসাবে আমাদের যায় আসে। সরকারি অপশাসন, চুরি ও লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আমরা যথেষ্টই চিন্তিত এবং প্রয়োজনে এই অপদার্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে আমরা টেনে নামিয়েও দিতে পারি।

কিন্তু আমাদের সকলের বোঝা দরকার যে ২০১১ সালে পরিলক্ষিত জনগণের এই ক্ষোভ, এই আক্রোশ কেবলমাত্র আর্থিক দুর্নীতি নামক একক বস্তুটির প্রতি ঘৃণাবশত এমন নয়। এই ক্ষোভ ও আক্রোশ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যে অপশাসনের ঐতিহ্য, যে 'ব্যবস্থা' যার অন্তর্গত উৎকোচ দেওয়া ও নেওয়া দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার অন্তর্গত সরকারি মহলে সর্বত্রই আমরা সুশাসনের প্রতি চরম নির্লিপ্ততার সম্মুখীন হই, যার ফলে সর্বক্ষেত্রেই সাধারণ সামান্য নাগরিক যে সর্বপ্রকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়, এই সমগ্রটারই বিরুদ্ধে।

১৯৪৭-এর 'ক্ষমতা হস্তান্তর'-এর পর বৃটিশ-প্রদত্ত আমলা ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণপ্রশাসনিক কাঠামোটাকেই আমরা যে প্রায় অক্ষত অবস্থায় রেখে দিয়েছি সেই নিয়ে বহু বিতর্ক ইতিমধ্যেই এ দেশে হয়েছে, তাই সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঔপনিবেশিক শাসনকালে যেমন রাজপ্রশাসনের স্থাপত্যশৈলী থেকে শুরু করে তার রাজভাষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যবস্থার একটিমাত্র মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সাধারণ মানুষকে যতটা দূরে ঠেলে রাখা, তার মনের মধ্যে সরকারি রীতিনীতি ও সরকারি আধিকারিক সম্বন্ধে ভীতি উৎপন্ন করা যাতে সরকারের থেকে নাগরিকের অধিকার দাবি করার সাহস কখনই না জন্মায়; সেই পরম্পরাই স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতে সগৌরবে রক্ষিত হচ্ছে।

**কেন ব্যবস্থা পরিবর্তন?**

আজ থেকে একশ' বছর আগে গান্ধীজী তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' নামে পুস্তিকায় উল্লেখ করেছিলেন যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা আমাদের ওপর যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে তা হয়তো তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আদর্শ, সাদা এবং কালো উভয় বর্ণের 'সাহেব'দের জন্য হয়তো অতি উত্তম, কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ ভারতবাসীর প্রয়োজনানুযায়ী নয়। গান্ধীজী স্বাতন্ত্র্যকে দেখতেন কেবলমাত্র রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর রূপে নয় বরং সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থার ভারতীয়করণের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ভারতের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার চাইতে সমাজ ব্যবস্থার অধিক গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। তিনি ভারতে বৃটিশ উপনিবেশবাদকে একটি সামাজিক ব্যাধির রাজনৈতিক উপসর্গ মনে করতেন এবং গ্রামীণ পুনর্গঠনের বাস্তব পরিকল্পনা তিনি কেবলমাত্র লেখনীর মাধ্যমেই তুলে ধরেছিলেন এমন নয়, শ্রীনিকেতনে সেই পরিকল্পনা নিজে বাস্তবায়িতও করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই সমস্ত মনীষীদের চিন্তাভাবনা সরকারি কর্মসূচীতে কোনও স্থানলাভ করল না। যে কংগ্রেস গান্ধীর

আদর্শের অনুপ্রেরণা দাবি করে, যারা গান্ধীমূর্তিতে মাল্যদান করতে বা রাজঘাটে গিয়ে মাথা ঠেকাতে কোনও সুযোগ ছাড়ে না (অবশ্য মিডিয়া সঙ্গে থাকলে), জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে সেই কংগ্রেস গান্ধীর শিক্ষা ও অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি।

এই পরিত্যাগের কারণ নেহরু আপাদমস্তক পাশ্চাত্য চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ নিজেদের মধ্যে বহু পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনেই ভারতীয় চিন্তা, দর্শন ও পরম্পরার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিলেন। অপরদিকে নেহরু এই দেশের পরম্পরা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের বিষয় তাঁর অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় বহুবার দিয়েছেন।

কাজেই ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ এবং ১৯৪৮-এ গান্ধীজীর দেহাবসানের পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কয়েক বছরের মধ্যে যখন সর্দার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে, তখন দেশে চিন্তা ও কার্য উভয়ক্ষেত্রেই নেহরুবাদের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা ঘটে। এরই পরিণামস্বরূপ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো ও মানসিকতাকে স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরও আমরা কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন সত্ত্বেও মোটের ওপর অক্ষত অবস্থায় পাচ্ছি।

**প্রশাসনিক সংস্কার**

স্বাধীনতার পর থেকে প্রশাসনিক কাঠামো ও পদ্ধতিগত সংস্কার সম্বন্ধীয় বহু কমিশনের বহু সুপারিশে ধুলো জমেছে কিন্তু সামান্য কিছু অদল-বদল ছাড়া মৌলিক কোনও পরিবর্তন আসেনি। করণীয় কি? প্রথমত, আমলাতন্ত্র নামক যে 'স্থায়ী প্রশাসন' আছে তাকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। পুলিশ ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে এবং বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসেবে নয় পেশাদারি সংস্থা হিসাবেই তাদের সম্মান বজায় থাকে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনের প্রয়োজন আছে, কেবলমাত্র সরকারি মহলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয়, বেসরকারি এবং এন জি ও ক্ষেত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও। সরকারি ক্ষেত্রে 'কনট্রাকট' আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে 'মর্জি'র কোনও জায়গা রাখা উচিত নয়। কোনও ক্ষেত্রেই মর্জিমাফিক পৃষ্ঠপোষকতার কোনরকম স্থান থাকা উচিত নয়--- ঔপনিবেশিক সময়কালের 'মাই-বাপ' সরকারের ধারণা স্বাধীন ভারতের পরিত্যাগ করা উচিত। সম্প্রতি রাও ইন্দ্রজিৎ সিং-এর সভাপতিত্বে সংসদের স্থায়ী সমিতিতে কংগ্রেসের এক সাংসদ মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মধ্যে ব্যাপক হারে দুর্নীতি এবং ভুল তথ্য পরিবেশন খুঁজে পেয়েছেন। সমিতির প্রতিবেদনে তারা ব্যক্ত করেছে যে যেটুকু দুর্নীতি প্রকাশ করা গেছে তা এই প্রকল্পে আসলে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়া মাত্র ('দ্য স্টেটসম্যান', ৩০ আগস্ট, ২০১১)। সাংসদ এবং বিধায়কদের অঞ্চল বিকাশ যোজনার মধ্যেও ব্যাপক দুর্নীতির কথা বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদনেই উঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই দুর্নীতিরোধের উদ্দেশ্যে বিহারের রাজ্য সরকার বিধায়কদের জন্য এই প্রকল্প বাতিল করেছে। হয়ত সংসদ তহবিল এবং এই ধরনের মর্জিমাফিক পৃষ্ঠপোষকতামূলক প্রকল্প বাতিল করার কথা আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

সমস্ত ধরনের নাগরিক পরিষেবার জন্য নির্দিষ্ট সময়সূচি নির্ধারিত করা উচিত যাতে দুর্নীতির সুযোগ কমে যায়। প্রাপ্য পরিষেবার গতিবৃদ্ধির জন্যই অধিকাংশ উৎকোচের আদান-প্রদান হয়। এই প্রসঙ্গে 'নাগরিক চার্টার' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— কিন্তু এটিকে এখনও বাস্তবায়িত করা হলো না। বাস্তবায়নের পর যদি সঠিকভাবে লাগু করা যায় তবে নাগরিক চার্টার অনেকাংশে দুর্নীতি হ্রাস করতে পারবে।

প্রশাসনিক সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে পুলিশি সংস্কারও জরুরি— রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করার সঙ্গে যথাযথ বেতন কাঠামো, আবাসন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা অতি আবশ্যকভাবে করা উচিত যাতে পুলিশকর্মীরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করার উৎসাহ ও পরিবেশ পান।

প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় জটিলতা সর্বস্তরে দুর্নীতির সহায়ক। এই জটিলতা যে কোনও সরকারি দপ্তর এবং 'আম আদমি'র মধ্যে একশ্রেণীর দালালের জন্ম দেয় যারা সবরকম কাজ 'করিয়ে' দেয়। এর সমাধান হচ্ছে সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার যথাসম্ভব সরলীকরণ এবং মাতৃভাষায় যাবতীয় তথ্যাদি প্রদান করা, আবেদন পত্র ইত্যাদি মুদ্রিত করা, যাতে সরকারি দপ্তরে প্রবেশ করার ভীতি কাটিয়ে দালালচক্রের খপ্পরে না পড়ে মানুষ নিজের কাজ নিজেই করতে পারে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আন্দোলনে জন লোকপাল বিলের প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে। কেবলমাত্র কংগ্রেস দল ছাড়া প্রায় সমস্ত ভারতবাসী এই দাবিকে সমর্থন করেছেন। বলা বাহুল্য, শক্তিশালী এবং স্বতন্ত্র লোকপালের অত্যন্ত প্রয়োজন। আত্মরক্ষার তাগিদে কংগ্রেস দুর্বল এবং সহজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা যাবে এমন লোকপাল চায়। কিন্তু এই বিল সংসদে নিয়ে এসে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হয়তো প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাদের হস্তক্ষেপ অর্থাৎ আবার রাস্তায় নেমে আন্দোলনই তা দূর করতে পারবে।

**নির্বাচনী সংস্কার**

দেশজুড়ে দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের ফলে নির্বাচনী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহারই এদেশে দুর্নীতির মূল উৎস এবং এই 'গোড়ায় গলদ'কে ঠিক করতে না পারলে আমরা কোনওভাবেই দুর্নীতি নামক এই অসুরকে বধ করতে পারব না। এই সংঘর্ষে লিপ্ত সামাজিক সংগঠনগুলি 'ইয়ুথ এগেইনস্ট করাপশন' (ওয়াই এ সি) সহ প্রায় সকলেই নির্বাচনী প্রচারে সরকারি অর্থব্যয়ের প্রসঙ্গ তুলেছে। 'Right to Reject' এবং 'Right to Recall'-এর দাবিও আন্না হাজারে তুলেছেন যদিও অন্যান্য আন্দোলনকারী সংগঠন এই দাবিগুলি নিয়ে দ্বিমত ব্যক্ত করেছে। অপরপক্ষে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ— পরিচালিত 'ইয়ুথ এগেইনস্ট করাপশন' বাধ্যতামূলক ভোটদানের কথা বলেছে। YAC মনে করে যে বাধ্যতামূলক ভোটদানের ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণমান বৃদ্ধি পাবে এবং এর দ্বারা ভারতীয় রাজনীতিতে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।

**বিচারব্যবস্থার সংস্কার**

Judicial Standards and Accountability Bill, 2010-এর বিষয়ে সংসদের আইন ও বিচারব্যবস্থা সংক্রান্ত স্থায়ী সমিতি তার সুপারিশ ইতিমধ্যেই পেশ করেছে। এই বিল-এর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি National Judicial Oversight Committee গঠন করা হবে যা বিচারপতিদের বিরুদ্ধে আনা যেকোনও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করবে। পাঁচ সদস্যের এই কমিটির নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতি থাকবেন। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্ট এবং প্রতিটি হাইকোর্টে একটি করে তিন সদস্যের Scrutiny Committee থাকবে যার মধ্যে সেই কোর্টের দু'জন বর্তমান বিচারপতি ও একজন

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি থাকবেন। তাঁরা সেই কোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে যেকোনও অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্ত করবেন ও প্রয়োজনানুসারে সেগুলিকে Oversight Committee-র কাছে পাঠাবেন।

সরকারের মতে এই আইন প্রণয়নের দ্বারা বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির যথাযথ মোকাবিলা করা যাবে; কাজেই বিচারপতিদের লোকপালের আওতায় আনার দরকার নেই। এই প্রস্তাবিত আইনে বিচারপতিদের সম্পত্তির ঘোষণা ও তাঁদের জন্য লিখিত আচরণবিধিও বাধ্যতামূলক করা হবে। কিন্তু কোনও অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্তের পর ব্যবস্থা গ্রহণের অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি এই বিল-এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগায়।

বিচারব্যবস্থার জন্য জুডিসিয়াল কমিশন গঠনের প্রস্তাবও বহু বছর ধরে আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও দিনের আলো দেখেনি। পুরাতন মামলার বিরাট বোঝা লাঘব করতে আরও কোর্টরুম এবং বিচারপতির নিয়োগ প্রয়োজন। অন্যান্য সরকারি দপ্তরের মতো এক্ষেত্রেও কাজের মন্থর গতি দুর্নীতি র সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

আদালতের প্রক্রিয়া ও রীতিনীতি সহজ সরল হওয়া উচিত এবং স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও 'শ্বেতাঙ্গর বোঝা' বয়ে চলা বন্ধ করে ভারতীয় ভাষার ব্যবহার হওয়া উচিত। তাই বিচারের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সাধারণ মানুষের যাতে বোধগম্য হয়— সেটাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং তার মধ্যে বিস্ময় ও ভীতির উদ্রেক যেন না হয়!

**শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার**

ইতিপূর্বে আলোচিত প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার তবেই সফল হবে যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার করতে পারে। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিই সমস্ত ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে কোনও ব্যবস্থাকে সফল অথবা অসফল করে। শিক্ষাই জাতির মানসিকতা নির্মাণ করে এবং মানসিকতা নির্মাণের মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যত নির্মিত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতেও লর্ড মেকলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য মডেলের শিক্ষানীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী ছাড়াও, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মনীষী ও চিন্তাবিদরা ঔপনিবেশিক শিক্ষার পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পরও একাধিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষার কাঠামো এবং পাঠক্রমে আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে কিন্তু তাদের সমস্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ সরকারি অফিসের তাকে কেবলমাত্র ফাইলেরই বোঝা বাড়িয়ে গেছে।

শিক্ষাব্যবস্থা বলতে মূলতঃ বোঝায় প্রথমত পাঠক্রম এবং দ্বিতীয়ত শিক্ষণ পদ্ধতি। পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী'র বক্তব্যই যথেষ্ট। স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরের প্রশ্নপত্র থেকে মনে হয় মুখস্থ বিদ্যাকেই আমরা শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পদ্ধতি বলে মেনে নিয়েছি। বিষয়বস্তুকে বোঝার ওপর আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে না। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে কেবলমাত্র মুখস্থভিত্তিক শিক্ষা মানসিক বিকাশ ঘটায় না, কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি করে না।

প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা পরা ও অপরা, এই দুই ধরনের বিদ্যাকেই স্থান দেয়। পরা বিদ্যা মানে শুধু ধর্মশিক্ষা নয়, বরং নিজেকে জানার জন্যই এই বিদ্যা অপরিহার্য। আমি কে, সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এই বিদ্যার দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। এই আত্মজ্ঞানই মানুষকে চরিত্রবান করে, তার মূল্যবোধ গড়ে তোলে, সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে। ধর্মনিরপেক্ষতার হাঁড়িকাঠে পরাবিদ্যা ও মূল্যবোধশিক্ষাকে আমরা বলি দিয়েছি।

কৌতুকের বিষয়, মেকলে-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির উৎসস্থল বৃটেনকে গত বছরের সপ্তাহব্যাপী দাঙ্গা ও বিশৃঙ্খলার পর খোদ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন 'ভগ্ন বৃটেন' (Broken Britain) বলে বর্ণনা করেছিলেন। বৃটেনের শৃঙ্খলাহীন যুবসমাজকে কিভাবে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান ও মূল্যবোধের পথে চালিত করা যায়, সেদেশের শাসকবর্গ আজকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হিমশিম খাচ্ছে। আর আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা এখনও সহাস্যবদনে তাদেরই অনুকরণ করে যাচ্ছে!

শিক্ষার অধিকার আইনের ধারা অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া আরেকটা চরম ভ্রান্তির লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি তুলে দেওয়ার পরিণাম আমরা ভুগছি আর সেই পরিণামই সারাদেশে নিয়ে আসার পরিকল্পনাই যেন কেন্দ্রীয় সরকার করেছে। এই হঠকারী সিদ্ধান্ত পাল্টানো প্রয়োজন। ছাত্রের ওপর বোঝা লাঘব করার বিকল্প ব্যবস্থা হতেই পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। আমাদের শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১০ : ৮০। তুলনায় অধিকাংশ উন্নত দেশগুলিতে এই অনুপাত ১০ : ৩০। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা পরিসংখ্যান, অর্থাৎ কত ছাত্র ভর্তি হলো, কত ছাত্র পাশ করল ইত্যাদির ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন কিন্তু পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার গুণগত মানবৃদ্ধির ওপর তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব প্রদান করেন।

**চাই সামগ্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তন**

৬৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমাদের প্রজাতন্ত্রকে আরও প্রজাতান্ত্রিক করার জন্য, মানুষের আরও কাছাকাছি প্রশাসনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নাগরিক পরিষেবা সঠিকভাবে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য, সামগ্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের পথে আমাদের এগোতে হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষেত্রে শৈথিল্যে ভুগছে, কিন্তু দেশের পথেঘাটে সেই শৈথিল্য এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জন-আন্দোলনের জোয়ার দেখিয়ে দিচ্ছে যে সরকার ভুগলেও এই দেশ শৈথিল্যে ভুগছে না। দেশের মানুষ চায় এগিয়ে যেতে। গত এক বছরের এই আন্দোলন দেশের মানুষের বিশেষ করে যুবদের হৃদয় স্পর্শ করেছে কেবলমাত্র আর্থিক দুর্নীতি বা জনলোকপালের কারণে, এমন ভাবলে ভুল হবে। বরং এই আন্দোলন আমাদের দেখাচ্ছে যে দেশের সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। এই সঙ্কটের সময়ে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মুখ দেখলে মনে হয় যে সাধারণ মানুষ কি চায় তারা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তাই এই বুঝে উঠতে না পারাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর নামে ৪.৫ শতাংশ সংরক্ষণ ইত্যাদি সংবিধান-বহির্ভূত ও ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের মানুষেরই দায়িত্ব আরেকবার তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে তাদের গলদটা কোথায় আর আমরা দেশের সরকার ও শাসকদের ঠিক কোন ভূমিকায় দেখতে চাই।

**স্বস্তিকা**

**প্রতি সংখ্যা — ৭.০০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা**

# জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্দীপিত হওয়ার সময় এসেছে

কাঞ্চন গুপ্ত

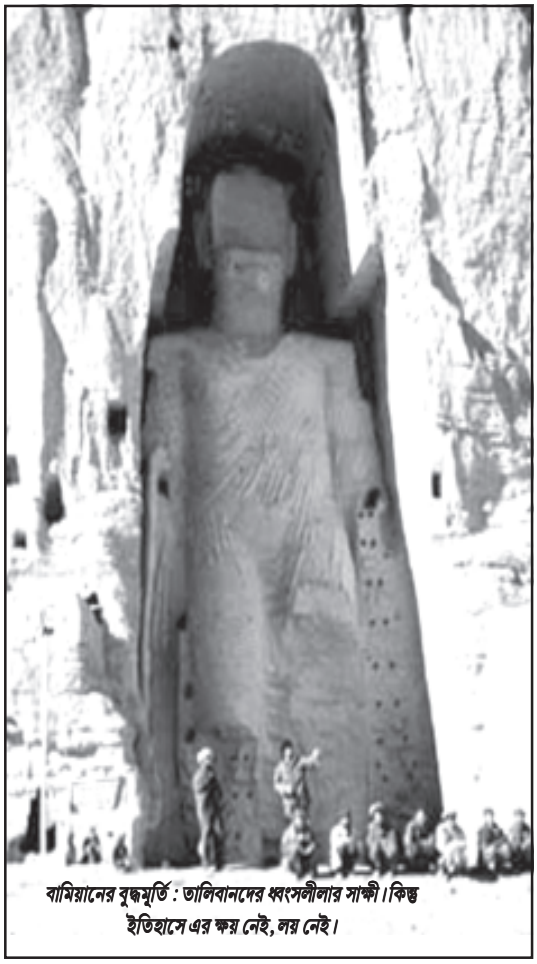

*বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি : তালিবানদের ধ্বংসলীলার সাক্ষী। কিন্তু ইতিহাসে এর ক্ষয় নেই, লয় নেই।*

আমরা প্রায়ই ভারত ভাবনা সম্পর্কে পড়ি এবং শুনি। যার মধ্যে বলা হয় বহু কোটি মানুষের দেশের গৌরবের কথা। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে একদশক পার করেছি এবং স্বাধীনতার পর ছ'টি দশক অতিক্রম করেছি। কিন্তু হিন্দু জাতির এক বড় দেশ বলে খুব একটা গৌরব অনুভব করি না। অথচ আমাদের জাতীয়তার মধ্যে, জীবন-ধারার মধ্যে হিন্দু নীতি-আদর্শ রয়ে গেছে। আজকের রাজনৈতিক ভাব-ভাবনার সঙ্গে 'ইন্ডিয়া' শব্দটা জড়িয়ে গেছে, রাজনৈতিক কথাবার্তায় ইন্ডিয়া প্রসঙ্গ আসে কিন্তু তার মধ্যে বাম অনুসারী চিন্তা থাকে। জাতীয়তাবাদ মেলে না।

আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে ভাবার সময় এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনকালে ভারত যে একটি প্রাচীন দেশ এটা মনে রাখা হচ্ছে না। ভারত ভাবনার অনেক দিকই যেন গুরুত্ব পাচ্ছে না। জাতি হিসেবে ভারতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, যেখানে বহু ভাষাভাষী মানুষের বসবাস ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের জাতি ও জাতীয়তাকে দেখা দরকার তার বহুকালের প্রাচীন সভ্যতার কষ্টিপাথরে। যাকে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, সংস্কৃতির রেশমী বন্ধন। বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষের জীবনধারার সমন্বয়ের কথাই এর মধ্যে বলা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনের পরে ভারত যখন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে পরিচিত হলো (সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় মিলেছে অনেক পর, ইন্দিরা গান্ধীর অন্ধকারময় জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে।) তখন গণতন্ত্রের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভারতীয়ত্বের কোনও পরিচয় দাবি করা হলো না। যেমন রাষ্ট্র এবং জাতি হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত স্বতন্ত্র পরিচিতি পেয়েছিল। আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রধানত নির্ভর করেছে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। নতুন দিনের জাতিগত ভাবনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তর ব্যবধান। তালিবানরা রাশিয়ান বুদ্ধ-স্মৃতি ধ্বংস করে আনন্দ পেতে পারে। কিন্তু তারা সেই ইতিহাসটা মুছে ফেলতে পারেনি যেখানে বলা হয়েছে কান্দাহার একসময় ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক নিদর্শন। সিন্ধু নদ পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও মুছে দেওয়া সম্ভব হয়নি অতীতকে, যেখানে রয়েছে ভারত-সভ্যতার ইতিবৃত্ত। এখন আমরা ভেঙে পড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিচিতি পেয়েছি, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আর আমাদের মেরুদণ্ডহীন নেতাদের জন্য বর্তমানে ভারতের নূতন পরিচিতি হলো 'ভারতীয় উপমহাদেশ।'

ভারতীয় জাতি হিসেবে একসময় যে পরিচয় ছিল, আমরা আজ তা হারিয়ে ফেলেছি। অনেক রাজ্য, বিভিন্ন রাজার শাসনাধীন এলাকা একসঙ্গে মিলেছিল ভারত সংস্কৃতির রেশমী বন্ধনে। সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সভ্যতা ও শক্তি নিহিত ছিল। সেই 'অখণ্ড ভারত'-এর স্বপ্ন পূরণ হয়নি ঠিকই, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ একটুও কমেনি বা লোপ পায়নি। এখন সত্যিই সেই ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার ও পুনরায় শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের প্রয়োজন আছে। নতুনভাবে সব দেখার মাধ্যমে আমাদের জাতি ও জাতীয়তাবোধ জাগবে। বিশেষ করে দেশের যে তরুণ সমাজ নিজেদের 'বিশ্বনাগরিক' হিসেবে দাবি করে ভারতের কঠিন বাস্তব পটভূমি থেকে সরে থাকতে চাইছে, তাদের কাছে নুতনভাবে ভারতীয় সভ্যতার কথা তুলে ধরা দরকার। আমাদের দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে কত সমৃদ্ধ ও শান্তিময় ছিল একসময়ের ভারত। সেই গৌরবময় জাতির কথা তুলে ধরতে হবে ঠিকভাবে। আমাদের দেশ কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলে যাঁরা অন্যদেশে চলে

যেতে চাইছেন তাঁদেরকে এটা বোঝানো দরকার। আমরা তাঁদের সামনে অনেক কিছু তুলে ধরে পুনরাবিষ্কারে সাহায্য করতে পারি। অনেকরকম চমকপ্রদ ভাবনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব যার মধ্যে ভারতীয় জাতি ও জাতীয়তা ব্যাপারটা থাকবে। যার মধ্যে প্রকাশ পাবে অভিন্ন পরিচিতি ও অভিন্ন ভাবনা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উজ্জলবর্ণ। বিনায়ক দামোদর সাভারকার এরকম ভাবনা থেকেই 'এক জাতি, এক মানুষ, এক সংস্কৃতি'র সপক্ষে বলেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য 'একরূপতা' করার দিকে ছিল না, তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'একাত্মতা'র উপর। যাতে বোঝা যাবে ভারত একটি দেশ, ভারতীয়রা সে দেশের মানুষ। তাঁর কাছে ভারত ছিল 'পিতৃভূমি' এবং 'পুণ্যভূমি'। এর মধ্যে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থাকছে, সবকিছুর উপরে থাকছে জাতি আর দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, যেখানে কাটবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। একই ভাবনা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণাদায়ক লেখার মধ্যে। তিনি দেখেছেন দুর্গার মধ্যে বাংলার শক্তিভাবনাকে। ভারতকে মাতৃভূমি হিসেবে দেখেছেন আর ভারতবাসী সেই মায়ের সন্তান। যে ভারতবাসী মাকে বন্দনা করবে বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করে। এর মধ্যে জাতি ও ভারতীয় জাতীয়তা ভাবনা স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাও ছিল একইরকম জোরালো। তিনি দেখেছিলেন আমাদের দেশকে বহু মানবের বিচিত্র ধারার মিলনস্থল রূপে যা ভারতের পূর্ণ পরিচয় বহন করে। জনগণমন সেই ঐক্যের পরিচয়ই তুলে ধরেছে।

বেদনার ব্যাপার হলো এইসব মনীষীদের প্রেরণার বাণীর মাধ্যমে আমরা দেশের যুবসমাজকে উৎসাহিত করতে পারছি না। সাভারকারের আত্মজাগরণী বর্ণনায় দেশকে পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলা, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের দেশকে মা রূপে বন্দনার মন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের ভারতগাথাও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি যুবমানসে। তারা জাতীয়সঙ্গীত গায় ঠিকই, কিন্তু কোনওরকম আবেগ ও শ্রদ্ধা তার মধ্যে থাকে না। আর যে আধুনিক ভারতের কথা বলা হচ্ছে তা কোনওরকম রেখাপাত করে না বিদেশি অতিথিদের মনে। বরং তারা অস্বস্তিবোধ করে। অন্যত্র হয়তো ভারতীয়রাও একইরকম অস্বস্তির মুখোমুখি হয় জাতীয়সঙ্গীত যখন বাজে, তখন তারা মুখ বন্ধ রাখাই শ্রেয় মনে করে। তারা দেশের সামগ্রিক রূপের কথা ভাবতে চায় না বা পারে না। তাদের চোখে দেশাত্মবোধ ও দেশগৌরবের যাবতীয় ব্যাপার সীমাবদ্ধ থাকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার মধ্যে। যা তাদের কাছে ফ্যাশন ছাড়া আর কিছু নয়। এম এস শুভলক্ষ্মীর গাওয়া বন্দেমাতরম যদি তরুণসমাজ শোনে, তাহলে বুঝতে পারবে সে গানের গভীরতা এবং ব্যাপ্তি কতখানি। আমি সেই গান শুনেছিলাম ইন্টারনেটে। বুঝেছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের ভাবনা একসূত্রে বেঁধেছে আমাদের।



*সিন্ধু নদ : যার কূলে বর্তমান পাক-ইসলামি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের সহস্র চেষ্টাতেও ভারত সভ্যতার চিহ্ন বিলীন হয়ে যায়নি।*

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের পর বারাক হোসেন ওবামা বলেছিলেন, "আমরা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমাদের জাতিকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এবং আমাদের দেশবাসী জানেন মহাঅনিশ্চয়তার কথা। তবে আমেরিকার ইতিহাস জানায়— সেখানে সঙ্কটে বিপদে সমস্যায় মানুষ এক হয়েছে। এবং আমরা জানি, সবকিছুর প্রয়োজন আছে। আজ নুতন দায়িত্ব নেওয়ার দিনে আমরা মনে করতে পারি আমেরিকার গণতন্ত্রের দুশো বছরের উত্তরাধিকারের কথা, যা আমাদের কাছে নিছক জন্মগত অধিকার নয়। এ হলো গৌরবময় দায়িত্বভার যা আমাদের বহন করতে হবে। আজ সময় এসেছে, আমাদের আরেকবার একসঙ্গে এগোতে হবে দেশের জন্যে, জাতির জন্যে..." রাষ্ট্রপতির ২০ জানুয়ারি, ২০০৯-এ এহেন ঘোষণার মধ্যে ছিল জাতীয় ভাবনা ও জাগরণ দিবস হিসেবে পালনের ডাক। উদ্দেশ্য, নাগরিকরা পরস্পরকে সাহায্য করা আর আমেরিকাকে নুতন দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

যে দেশের অস্তিত্ব মাত্র দুশো বছরের তারা ভাবছে গৌরবময় দায়িত্বভার সম্পর্কে! আর আমরা এমন এক দেশে বাস করি যার অস্তিত্ব বহু শতাব্দীর। আমরা উত্তরাধিকার বহন করছি আবহমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারার। তাকেও আমরা বোঝা ভাবছি। এখানেই লুকিয়ে রয়েছে ভারতের বেদনা। এই প্রজাতন্ত্র দিবসে আমাদের উচিত রাজনীতিকদের আর তাঁদের বিতৃষ্ণাময় রাজনীতিকে আর আমল না দেওয়া। তাঁদের সবরকম মতলবকে অগ্রাহ্য করে আমরা এক জাতি, এক প্রাণ— এই ঐক্য বন্ধনে নিজেদের জাগাতে পারি না কি? জাতপাত, ধর্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে যেভাবে সংঘাত বাধে তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই ভারতীয়ত্ববোধের বা চেতনার প্রয়োজন। তার মাধ্যমে দুটো জিনিস হবে। আমরা জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারবো। সেইসঙ্গে জাতি হিসেবে আমরা একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা ও অগ্রগতির বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবো।

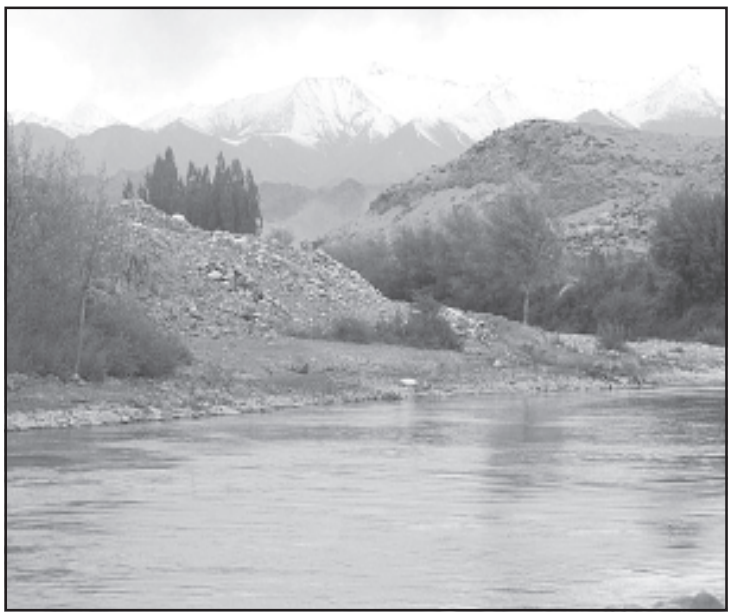

***(সৌজন্যে অর্গানাইজার।
লেখক 'দ্য পাইওনীয়ার'-এর
সহযোগী সম্পাদক।)***

# ভারতের স্বদেশী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োজন

অতিথি কলম

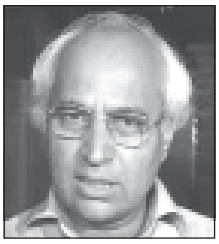

সুধীন্দ্র কুলকার্ণী

প্রত্যেক নতুন বছর আসার সন্ধিক্ষণে আমি উদগ্রীব থাকি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের জন্য। দেশের সর্বোচ্চ মেধা সমাগমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক উন্নতির প্রয়োগ করে দেশকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়— এমন সব আলোচনায় নজর রাখাই আমার উদ্দেশ্য। দেশের মানুষকে শিক্ষিত ও সজাগ করতে টিভি চ্যানেলগুলি যে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেই সংক্রান্ত কোনও দিক্‌নির্দেশকারী আলোচনাই লক্ষ করা গেল না এবারের কংগ্রেসে। চ্যানেলগুলি সিনেমা, ক্রিকেট আর অপরাধী জগতের খবর নিয়েই মশগুল।

*ভুবনেশ্বরে ৯৯তম বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সঙ্গে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক ও অন্যান্যরা*

বহু ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কথা ও কাজের মধ্যে দুস্তর ফারাক থাকলেও ভুবনেশ্বরে সদ্য সমাপ্ত ৯৯তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁর উক্তিটি খুবই সুচিন্তিত। শ্রী সিং বললেন ''এই সম্মেলনের মঞ্চকে সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রশ্নটির অনুসন্ধানেই ব্যবহার করার সময় হয়েছে। সেই প্রশ্নটি হলো, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? এটির কোনও চটজলদি উত্তর নেই। তবে উন্নয়ন ও দারিদ্র্যের দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবক নীতিকে এমনই হতে হবে যা জাতীয় লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও দেশের আমজনতার উন্নয়নেরই অনুসারী হবে।''

প্রধানমন্ত্রী সঠিক উদ্বেগ ব্যক্ত করেই বলেছেন, আমাদের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি মৌলিক গবেষণাতেই (fundamental research) লিপ্ত আছে, অথচ প্রয়োজনীয় ফলিত গবেষণা (applied research) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি জানান, গবেষণাকে স্বল্প ব্যয়ে দেশের মানুষের খাদ্য, শক্তি ও জলের নিরাপত্তা যোগানোর ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করাতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে কিভাবে সহজে বাস্তবায়িত করা যায় এই বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য একান্তই জরুরি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিজ্ঞান আমাদের সম্পদের আরও সঠিকভাবে ব্যবহার করার রাস্তা দেখাবে। আর প্রযুক্তি উন্নয়নের সুফল যাতে সব থেকে দরিদ্রতম মানুষটির কাছেও পৌঁছোয় তার দিক্‌নির্দেশ করবে।

খুবই যুক্তিগ্রাহ্য ও সময়োপযোগী কথা। কিন্তু আদতে প্রধানমন্ত্রীর পরিচালিত সরকার তাঁর কাঙ্ক্ষিত বক্তব্যের বাস্তবায়নে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার অভিমুখ কি সত্যি সত্যিই একটি সংহত, প্রয়োজনীয় করতে পেরেছে এবং দেশের ক্ষেত্রে তার সার্থক প্রয়োগসম্মত ব্যবস্থা নেওয়ার কি চেষ্টা করছে? মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় এখনও হাত গুটিয়ে রয়েছে। বাস্তবে এই মহা-গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে সংস্থার বাড়ি তৈরি, বাড়ির সৌন্দর্যায়ন, গবেষণাপত্র প্রকাশ, আলোচনা -চক্রের আয়োজন ও উপস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। অবশ্যই বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে জি ডি পি-র বরাদ্দ শতকরা ১ থেকে বাড়িয়ে ২ শতাংশ করার দাবী যুক্তিসঙ্গত হলেও এই বর্ধিত বরাদ্দ কি প্রধানমন্ত্রীর ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার সহায়ক হবে? বর্তমানে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিভাগ তাদের অর্থ কোথায় কিভাবে খরচ করছে?

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের প্রাক্কালে উন্নয়নের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে আমি লক্ষ্ণৌ যাই। সকলেই জানেন দেশের ২০ কোটি জনসংখ্যার এই রাজ্যটি দেশের মধ্যে জনসংখ্যার নিরিখে বৃহত্তম হলেও পিছিয়ে পড়া রাজ্যটিতে আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কী প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে সেটিই সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। পরিতাপের কথা আমাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিভাগের এই সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ এখনও বাস্তবানুগ নয়। কৃষির পরেই উত্তরপ্রদেশের বিপুল জনসংখ্যার গরিষ্ঠসংখ্যকই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছেন। বেনারসের তাঁতিরা, ভাদোহীর কার্পেট নির্মাতারা, আলিগড়ের তালাওয়ালারা, বেরিলির জরির কাজ যাঁরা করেন, কনৌজের সুগন্ধি দ্রব্যের কারবারিরা, কানপুরের চর্মশিল্পীরা, ফিরোজাবাদের কাঁচের শিল্পীরা, খুরজার সেরামিক্সের কর্মীরা, সাহারানপুরের কাঠশিল্পীরা এমন কত কি কর্মকাণ্ড তাঁরা পেটের দায়ে হলেও একনিষ্ঠভাবে করে চলেছেন। এইসব আধা অক্ষরজ্ঞান বিশিষ্ট শিল্পীদের নিপুণতা,

সৌন্দর্যজ্ঞান এবং চিরাচরিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী মুন্সিয়ানা অবিশ্বাস্য। হায়! পরিকল্পনা কমিশনের তরফে সর্বশেষ প্রকাশিত উত্তরপ্রদেশ সংক্রান্ত বিপুল ভারী রিপোর্ট ঘেঁটে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ও উল্লেখিত নানান কুটিরশিল্পের উন্নয়ন বিধানের নিদানগুলি একান্তই অপ্রতুল ও দায়সারা বলেই মনে হলো। সন্দেহ নেই উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক অধোগমন মূলত রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি ও শাসনব্যবস্থার অপরাধীকরণের কারণেই ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতটিকে বিবেচনায় আনলে দেখা যাবে সেখানেও ভারত নামের দেশটির অধিবাসীদের প্রয়োজন। মেধা সম্পদ ও উৎপাদনশীলতার সঙ্গে ভারতের অধীনে থাকা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত 'সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি' বিভাগের কাজকর্ম এবং অভিমুখ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন।

এগুলির যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার না করলেও, কেবলমাত্র উৎকর্ষ কেন্দ্র (Centre of Excellence) নির্মাণ করাই সরকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ভারতের আজ দরকার 'পরিপূরক উৎকর্ষকেন্দ্র' (Centre of Relevance)। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন ''উদ্ভাবন, আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রায়োগিক দিকটিই প্রধান বিবেচ্য করতে হবে যাতে উদ্ভাবিত তত্ত্বটি কেবলমাত্র নতুন একটি বিষয় হয়েই না ফুরিয়ে যায়''।

উন্নয়নের তথাকথিত পাশ্চাত্য মডেলটি আমাদের চোখের সামনেই এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উদ্দেশ্য ও সামগ্রিক অভিমুখ স্বদেশী ভাবনার দিকে ঘোরাতেই হবে। এই 'স্বদেশী' শব্দটিকে আমাদের বুদ্ধিজীবীকুল ইতিমধ্যেই একটি পরিত্যাজ্য শব্দে রূপান্তরিত করলেও সর্বব্যাপী উন্নয়নের (inclusive development) স্লোগানটিকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে গেলে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রেই নয়; অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রকেই স্বদেশের সম্পদ, মানবশক্তি, প্রয়োজনানুযায়ী ও জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই কাজ করতে হবে। কথাটা শুনলেই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ধুয়ো তুলবেন— আরে আরে এই ভুবনীকরণের যুগে স্বদেশী তো একটি তামাদি, বিচ্ছিন্নতাবাদী, প্রাসঙ্গিকতাহীন ধ্যান ধারণা। এঁদের মনে রাখা দরকার মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবদ্দশায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যাবহিত পরেই বলেছিলেন, ''Independence is and ought to be as much the ideal of man as self sufficiency'' (দেশের স্বাধীনতা অর্জনের আদর্শের সঙ্গে দেশবাসীর স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠাও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ)। দেশীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দেশানুযায়ী ব্যবহার ও প্রয়োগ ভাবনা নিয়ে গান্ধী তাঁর জীবনভর প্রয়াস চালিয়ে গেলেও দেশবাসী ব্যাপারটি সুবিধাজনকভাবে বিস্মৃত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে বলেছেন, ''চীন বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আজ ভারতবর্ষের থেকে এগিয়ে গেছে।'' আশ্চর্য, চীন এমন বিরাট সাফল্য পেল কি করে? উত্তরটা সহজ, চীন তার দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বদেশী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, ভারতবর্ষ নয়।

***(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)***

# জাতীয় জীবন-মরণ সমস্যায় আজও অপরিহার্য যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দের পথনির্দেশ

**ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ**

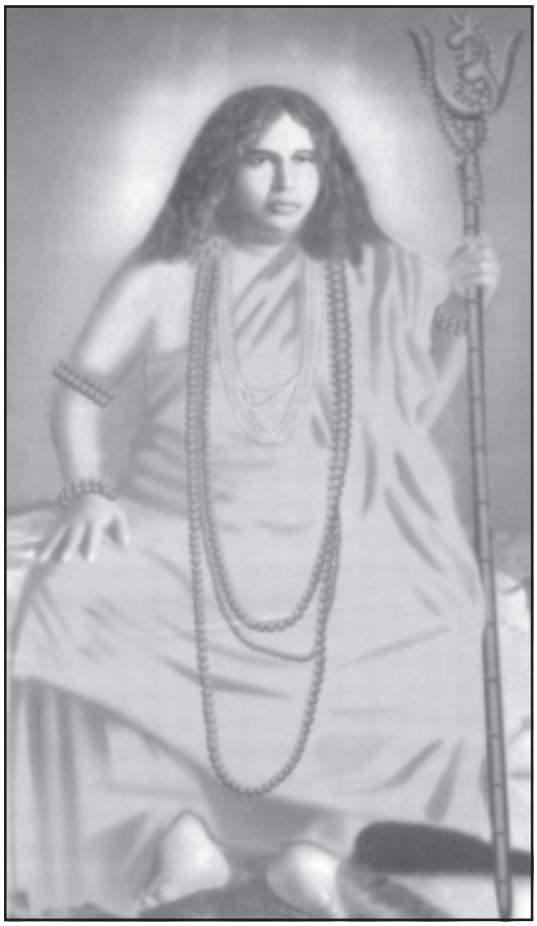

অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বাংশে— যা পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশ নামে পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে, অনেক বাবাজী, মাতাজী, গুরুজী, স্বামীজী, দাদাজী, ভাইজি, পরমহংস, ত্রিকালজ্ঞ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধপীঠ, মঠ, মন্দির, আশ্রমে দিবারাত্র নর্তন কীর্তন, সাধন ভজন, ভোজনপূজন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হোত। সাড়ম্বরে পালিত হোত মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব। তাতে কত মাদলের সুগভীর নিনাদে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হোত। নামকীর্তনের সুরঝঙ্কারে পাখি সব নীরব হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালাত। কোন গুরুর চেলারা কতো মন চাল-ডালের খিচুড়ি পাকাত, তা নিয়ে চলত অঘোষিত প্রতিযোগিতা। অগণিত শিষ্য-শিষ্যার দল ভাবত এ সুখেই তাদের দিন যাবে। তারপর একদিন পালে বাঘ পড়ল। এই বাঘ পড়ার পূর্বাভাস কোনও ত্রিকালদর্শী গুরুবাবা গুরুমা-রা তাদের শিষ্যমণ্ডলীকে দিতে পারেননি। তার ফলে অকালে প্রাণ হারাল শত সহস্র একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্যের দল; মান-ইজ্জত হারাল তাদের মা-বোনেরা। কোনও কোনও গুরু মহারাজ মাতাজীদের নিয়ে রাতারাতি পশ্চিমবঙ্গে পালালেন— পড়ে রইল তাদের সাধের আশ্রম, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ভজন মন্দির। সেসব আজ বিধর্মীর দখলে। কিংবা নিশ্চিহ্ন।

এঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হিন্দুদের দুর্দিনের সাথী যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ১৯৩২ সালে হিন্দুরা যাকে মহাত্মা বানিয়েছে, সেই এম কে গান্ধী গেলেন বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে— ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে জাহির করতে, কিন্তু গিয়ে দেখেন মুসলিম, শিখ, পারসিক, দলিত, রাজা-মহারাজাদের প্রতিনিধিরা সভা আলো করে বসে আছেন। তারা সবাই স্ব স্ব সমাজের প্রতিনিধি। অখণ্ড ভারতের প্রতিনিধি কেউ নেই। গান্ধীজীকে কেউ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে স্বীকারও করলেন না--- তিনি হিন্দু কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপেই স্বীকৃতি পেলেন। বৈঠক থেকে ফিরলেন হিন্দু সমাজকে বর্ণ হিন্দু ও তফশিলী হিন্দুতে দ্বিধা বিভক্ত করার উপঢৌকন নিয়ে। উপরন্তু কম্যুনাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মাধ্যমে বাংলার শাসনভার চিরস্থায়ীভাবে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করার সাংবিধানিক গ্যারান্টিও দেওয়া হলো।

বাংলার হিন্দুরা অথৈ জলে। বাংলার শাসন ব্যবস্থা থেকে তারা চিরতরে নির্বাসিত। তাদের বিদ্যার গৌরব, বুদ্ধির গৌরব, সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরব তো চিরতরে ধূলিসাৎ হবার ব্যবস্থা হলোই; এমনকী নারীজাতির মানসম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকারও নিজেদের হাতে রইল না। মুসলমানরা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে, বাংলার শাসনভার তাদের হস্তগত হতে না হতেই তাদের বৃটিশ শাসনে গুটিয়ে থাকা নখদন্ত বিকশিত হয়ে প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে।

আর কেউ না জানুক, যুগন্ধর স্বামী প্রণবানন্দের কাছে বাংলার হিন্দুদের জীবনে এই ঘনায়মান দুর্যোগের বার্তা পৌঁছুতে বিলম্ব হয়নি। সারা বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর সঙ্ঘের নীতি ও আদর্শ প্রচারে নিয়োজিত প্রচারকদের মাধ্যমে অসহায় হিন্দু নরনারীর আর্তনাদ ভেসে আসতে থাকে। ''১৯৩৮ খৃস্টাব্দে আচার্যদেবের আদেশে জুলাই মাসে কুমার সিং হলে এক সম্মেলনে কলকাতার হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট হিন্দু নাগরিকগণকে লইয়া যে সম্মেলন হয়, উহাতে সঙ্ঘকর্মিগণ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা পূর্বক হিন্দু নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সম্মেলনে আচার্যদেব বাঙ্গলার ''বিপন্ন হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায়'' সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, তাহাতে হিন্দু নেতৃবৃন্দের হৃদয়ে চৈতন্য ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয় :

''বাঙ্গলার হিন্দু আজ নানা ভাবে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত। ...বিভিন্ন জেলায় শহরে ও গ্রামে

প্রতিষ্ঠিত শতাধিক মিলন মন্দিরের কার্যতৎপরতার মধ্য দিয়া প্রতি সপ্তাহে যে সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতেছি— বাংলার পল্লীগ্রামে কোনও হিন্দুর ধর্মপ্রাণ-মান ও স্ত্রী কন্যার ইজ্জৎ লইয়া বসবাস একপ্রকার অসম্ভব। ...দীর্ঘকাল হিন্দু মুখ বুজিয়া সহিয়া আসিতেছে; প্রতিবাদটি পর্যন্ত করে নাই; বরং কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে মিলন ও শান্তি স্থাপনের জন্য বহু প্রকার চেষ্টা চলিয়াছে; দাবীর পর দাবী মিটানো হইতেছে; কিন্তু উৎপীড়নের স্রোত, উপশম হওয়া দূরের কথা, বন্যার জলের ন্যায় দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে নীরব সহিষ্ণুতার শেষ প্রান্তে আসিয়া হিন্দু আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান।" (শ্রীশ্রীযুগাচার্য জীবন-চরিত : স্বামী বেদানন্দ)

বাংলার সমৃদ্ধতর দুই-তৃতীয়াংশ খুইয়ে, বিপুল স্থাবর অস্থাবর হারিয়ে এবং মান-ইজ্জত বাঁচাতে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসার ৭৩ বছর পর (২০১১-১৯৩৮) হিন্দুদের অবস্থা কি ১৯৩৮ সালের থেকে উন্নত হয়েছে না কি অবনত হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের একটা বৃহৎ অংশে কি ''হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ ও স্ত্রী-কন্যার ইজ্জৎ লইয়া বসবাস একপ্রকার অসম্ভব" হয়ে পড়েনি?

২০১১ সালের কথা ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাই ১৯৩৮ সালের কথায়। তৎকালীন সঙ্গীন অবস্থায় হিন্দুদের বাঁচার পথ প্রদর্শন করেছিলেন আচার্য প্রণবানন্দ। ''আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আত্মরক্ষার্থ শক্তিসংগ্রহের উপায়— হিন্দু সঙ্ঘশক্তি সংগঠন। হিন্দু সঙ্ঘশক্তি গঠনের জন্য চাই উন্নত ও অনুন্নত যাবতীয় যাবতীয় শ্রেণীর হিন্দু-জনসাধারণের মিলন। এই মিলনকে অব্যাহত করিয়া তুলিতে হইলে একদিকে উন্নত শ্রেণীর হিন্দুকে হৃদয়বান দরদী হইয়া অস্পৃশ্যতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া অনুন্নত হিন্দু ভ্রাতৃগণকে ধার্মিক ও সামাজিক অধিকার দান করিতে হইবে।

অপরদিকে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুকেও ভিন্নধর্মাবলম্বীর স্তোকবাক্য ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া উন্নত শ্রেণীর হিন্দু ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ বিসর্জন দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে হিন্দু-মিলনযজ্ঞে যোগদান করিতে হইবে। আত্মরক্ষার প্রশ্নকেই সর্বপ্রধান বলিয়া জাতির সম্মুখে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে খুঁটিনাটি ভেদ বিবাদের কথা আপনা হইতেই তলাইয়া যাইবে।" (ঐ)

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা ভারতে হিন্দুদের জীবন-মরণ সমস্যায় আত্মরক্ষার একমাত্র রক্ষা-কবজের নির্দেশ ইদানীংকালে আর কোনও ধর্মীয় গুরু দিয়েছেন কি? স্বামী বিবেকানন্দ যে কথা কাগজে-কলমে বলেছেন, স্বামী প্রণবানন্দজী তাকেই হাতে-কলমে প্রয়োগ ও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই পথ ছাড়া হিন্দুদের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

**[স্বামী প্রণবানন্দের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত]**

# উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

## মায়াবতীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাচ্ছে সব দলই

**বাসুদেব পাল।।** আসন্ন ফেব্রুয়ারি মাসেই কয়েক দফায় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচন হচ্ছে। লোকসভার আসন সংখ্যার নিরিখে উত্তরপ্রদেশেই সর্বাধিক আসন। মোট ৮০টি। ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়ে গেছে। বহুদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ক্ষমতাসীন মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি, বিরোধী দল মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচনে অবতীর্ণ। এছাড়া রয়েছে অজিত সিং-এর লোকদল (কংগ্রেস-জোট) এবং কিছু আঞ্চলিক দলও। ২০০৭-এর পর রাজ্যবাসীর সামনে পছন্দমতো দলের সরকার নির্বাচনের সুযোগ এসেছে।

মায়াবতীর আগে রাজ্যে ক্ষমতা ভোগ করেছিল মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি। তাদের 'গুণ্ডারাজ'-এর বিরুদ্ধে রাজ্যবাসী মায়াবতীর দলকে গরিষ্ঠতা দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। আবার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল রাজ্যে বিরোধী আসনে থেকে যথাযথভাবে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে যথার্থ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেনি। বরং অনেকক্ষেত্রে দুর্নীতির পাঁকে পড়া মায়াবতী সরকারকে বাঁচিয়েছে। সুবিধাবাদী রাজনীতির সুবাদে লোক দেখানো লড়াই চালিয়ে গেছে। কেন্দ্রের বিরোধী দল বিজেপি-র এবার রাজ্যবাসীকে সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন দেওয়ার স্রেফ মৌখিক আশ্বাস নয়, বিশ্বাস করাতেও হবে। অবশ্য আগে বিজেপিও অখণ্ড উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাট সামলেছে।

**এবারের নির্বাচনে কোর ইস্যু :**

এ বিষয়ে অবশ্যই মায়াবতীর পাঁচ বছরের শাসনের কথা প্রথমেই উঠে আসে। অন্য তিন প্রমুখ দল— সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস ও বিজেপি'র নিশানায় মায়াবতী সরকার। সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবে বিগত পাঁচ বছরে কোন জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে তা অবশ্যই বিবেচ্য। বিগত নির্বাচনে মায়াবতী মুলায়ম সিং সরকারের অপশাসনকে মূল ইস্যু করে বাজিমাৎ করে দেন। নির্বাচনী স্লোগান ছিল— 'চড় গুণ্ডোঁ কে ছাতি পর, মুহর (ছাপ) লগেগী হাথী পর।" স্লোগানটা জমিয়ে দিয়েছিল নির্বাচনী ময়দান। তাই অতিষ্ঠ জনতা-জনার্দন হাতিতেই 'ছাপ' দিয়েছিল। যদিও সে সময় মায়াবতী অনেক দাগীদের (চিহ্নিত অপরাধী) প্রার্থী করেছিলেন। তা সত্ত্বেও মায়াবতীর দল একক গরিষ্ঠতা লাভ করে। প্রথমেই মায়াবতী দাগী মিত্রসেন যাদব (প্রাক্তন সাংসদ ও এক

সময়কার সিপিআই নেতা)-এর জেলবন্দী 'সুপুত্র' এবং 'বসপা' দলের দাগী বিধায়ক আনন্দসেনকে রাজ্য ক্যাবিনেটে সামিল করার কথা জোর গলায় ঘোষণা করে দেন। প্রসঙ্গত, আনন্দসেন-এর নিম্ন আদালতে সাতবছর জেল হয়েছিল। আর মিত্রসেন যাদব বর্তমানে মুলায়ম সিং-এর সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক পদপ্রার্থী। জেলে থাকার জন্য আনন্দসেন শপথ গ্রহণ করতে পারেনি। তবে জেল থেকে ছাড়া পেতেই আলাদা করে শপথ গ্রহণ করানো হয়। এখানে উল্লেখ্য আনন্দসেন নিজের শহর ফৈজাবাদের কলেজছাত্রী শশীকে প্রথমে অপরহরণ ও পরে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। আনন্দসেন যাদবকে মন্ত্রী করাটা জনতা-জনার্দনের আশায় ছাই নয় হিমশীতল জল ঢেলে দেওয়ার সামিল। আনন্দসেন যাদব-এর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত ছিলই। তাকে আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়াতে মন্ত্রীপদ থেকে সরাতে বাধ্য হন মায়াবতী।

আওরিয়া থেকে নির্বাচিত 'বসপা'র বাহুবলী বিধায়ক শেখর তেওয়ারিকে 'হপ্তা' (জোর করে টাকা আদায়) না দেওয়ার জন্য ওখানে চাকুরীরত এক ইঞ্জিনীয়ারকে মারধোর করে শেষ করে দেন। আদালতে মামলা হয়। তাকে বাঁচানোর সবচেষ্টা বিফল হয়, তারও যাবজ্জীবন সাজা হয়। এরই মাঝে আগের মায়াবতী মন্ত্রিসভার সদস্য অমরমণি ত্রিপাঠির সঙ্গে কবি মধুমিতা শুক্লার প্রেমকাহিনী দীর্ঘদিন সংবাদমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। গর্ভবতী কুমারী মধুমিতাকে হত্যা করা হয়। অমরমণিকে তখন মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিতে হয়। সি বি আই তদন্তে দোষী বলে চিহ্নিত অমরমণি সপত্নী এখন জেলের ঘানি টানছেন। বহিন মায়াবতীর দলের আর এক বিধায়ক পুরুষোত্তম নরেশ দ্বিবেদীর ক্ষেত্রে শীলু নামে এক কিশোরীর উপর দুরাচার (অন্য শব্দে বলাৎকার)-এর অভিযোগ উঠতেই শীলুকেই চুরির অভিযোগে জেলে পোরা হয়। সংবাদমাধ্যমে রগরগে খবর বেরোতেই পুরুষোত্তম ফেঁসে যান। এখন শীলু বাইরে আর পুরুষোত্তম জেলের হাওয়া খাচ্ছেন। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক গুড্ডু পণ্ডিতও প্রেমের ফাঁদে পড়ে জেলফেরত। পরে এক অপহরণ মামলায় আবার জেল। মায়াবতী কোনও অজানা কারণে তার উপর এতটাই মেহেরবান যে সামান্য এক বিধায়ককে মুখ্যমন্ত্রীর সমতুল্য 'জেড' শ্রেণীর নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। মায়াবতী মন্ত্রিসভার এক ডজন মন্ত্রীকে লোকায়ুক্তের প্রদত্ত দুর্নীতির মামলায় মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দিতে হয়েছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী স্তরের কয়েকজন মন্ত্রীকে তো অবৈধ যৌন সম্পর্কে অথবা ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত থাকার জন্যে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়। দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক এখন জনগণের সামনে বে-আব্রু হয়ে পড়েছে।

উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী মহারণে সব দল একে

অপরের বিরুদ্ধে বাছা বাছা তীর তূণ থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়তে শুরু করেছে। দলীয় আদর্শবাদ তত নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণ-প্রতি আক্রমণই বেশি চলছে এবং নির্বাচনের শেষ দফা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে।

**বসপা :** ক্ষমতাসীন মায়াবতীর দল বসপা-র মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়ার আশ্বাস, প্রদেশকে চারভাগে টুকরো করার নাটকীয় চাল আর সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে বিচারই হবে নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের কষ্টিপাথর। বহিনজী সরকারে থাকার লাভটা কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে নিতে যে কসুর করবেন না একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। এবারের নির্বাচন মায়াবতীর পক্ষে মোটেই সহজ নয়। দলও আগের মতো এককাট্টা নয়। প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ নেই বরং অবিশ্বাস বাড়ছে।

**সমাজবাদী পার্টি :** অনেকে আশা করেছিলেন, মুলায়ম আগের ভুল শুধরে নিয়ে নতুন উদ্যমে নির্বাচনে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু তেমন লক্ষণ দেখা যচ্ছে না। পূর্বকথিত গুড্ডু সিং-এর বিরুদ্ধে দল রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু সেই গুড্ডু যখন বসপা থেকে বহিষ্কৃত হলো, সঙ্গে সঙ্গে 'সপা' তাকে লুফে নিল। গুড্ডু সিং মুলায়মের দলের প্রার্থী। জেলবন্দী প্রাক্তন মন্ত্রী অমরমণি ত্রিপাঠীর পুত্র অমনমণি ত্রিপাঠীকেও 'সপা' প্রার্থী করেছে। এরপরও যদি মুলায়ম ও তার দল নিজেদের সাচ্চা বলে জাহির করেন, তা জনগণ বিশ্বাস করবেন না।

**কংগ্রেস :** উত্তরপ্রদেশ দীর্ঘকাল থেকে কংগ্রেসের হাতছাড়া। পুনরুদ্ধারে সদম্ভে নেমেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী। রাহুল দুর্গ পুনরুদ্ধারে যতই দৌড়ঝাঁপ করুন, কেন্দ্র সরকারের দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা তাঁকে তাড়া করে ফিরবেই। গত ২২ বছর ধরে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের হাতছাড়া। দলও আগের তুলনায় দিন দিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। রাহুলের ম্যাজিক বিহারে কাজ করেনি। উত্তরপ্রদেশেও কাজ করবে বলে মনে হয় না।

**বিজেপি :** বিজেপি পরপর দু'বার বিধানসভা নির্বাচনে হেরেছে। অনেক নামীদামী ওজনদার নেতা দলের সঙ্গে নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও দল সংগঠনকে শক্তিশালী করতে অনেক আগে থেকে গা লাগিয়েছে। সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর নীতিন গডকরি উত্তরপ্রদেশে বরাবর নজর রেখে চলেছেন। উমা ভারতীকে দলে ফেরানো এবং তাঁকে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব দিয়ে তিনি 'গুরুত্ব' বুঝিয়ে দিয়েছেন। নম্র-বিনয়ী দলের এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব সঞ্জয় যোশীও সঙ্গে আছেন। প্রাক্তন সভাপতি রাজনাথ সিং এবং সহ সভাপতি কলরাজ মিশ্র আদবানীর রথযাত্রার সময় পূর্ব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে জনতার দরবারে দলকে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ভালোমতো উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। দল মায়াবতীর ভ্রষ্টাচার নিয়ে প্রমাণপত্র সমেত প্রচারে ময়দান কাঁপিয়েছে। বিজেপি একাই নির্বাচনে লড়ছে। সংযুক্ত জনতা দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা শেষ সময়ে ভেস্তে গেছে— এটা একটা মাইনাস পয়েন্ট। যা হবে তা নির্বাচনের পরে। দুর্নীতির দায়ে বিতাড়িত মন্ত্রী কুশবাহাকে নিয়ে দলের মধ্যেই যে মতদ্বৈধতা ছিল, সেই সঙ্কট কেটে গেছে। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরপ্রদেশের জনগণ ভালোই জানেন, শ্রীরামমন্দির-এর পক্ষে বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও তথাকথিত 'সেকুলার' দলই নেই। যা করার তা বিজেপিই করতে পারে। যদিও এবারের নির্বাচনে মূল বিষয় দুর্নীতিই।